একটি
THE BUSINESS STANDARD
প্রকাশনা
ইজেল
২০ পৌষ ১৪৩১ | সংখ্যা ১৬৪
SATURDAY 04 JANUARY, 2025
চুল তার কবেকার...

অলংকরণ: মাহাতাব রশীদ

রহস্য গল্প

তরাস

ধ্রুব এষ

পোর্ট্রেট আঁকার কিছু কলাকৌশল আছে। কিছু মাপজোখের অনুপাত ইত্যাদি জানা থাকলে কাজে লাগে। সেসব বহু পরে জেনেছে, তার আগেই টাউনের বিখ্যাত পোর্ট্রেট আর্টিস্ট হয়ে গেছে নজরুল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, বিপ্লবী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের পোর্ট্রেট এঁকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে টাউনে। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, 'রূপসী বাংলা'র কবি জীবনানন্দ দাশের পোর্ট্রেট করেছে। জুবিলী স্কুলের হেড মাস্টার আবদুর রহমান স্যার ছিলেন শিল্পানুরাগী। ফাইন আর্টসে পড়তে বলেছিলেন নজরুলকে। ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টস ঢাকায়। এসএসসি পাস করে ভর্তি হতে হয়। নজরুল ফাইন আর্টসে পড়েছে। বিখ্যাত হয়েছে পোর্ট্রেট পেইন্টার হিসেবে। কাজ করে নানা মাধ্যমে। জল রং, অ্যাক্রিলিক, প্যাস্টেল, তেল রং, চারকোল, পেন অ্যান্ড ইংক। সেরা কাজ করে তেল রঙে। টিয়া পাখি কাঁধে আহমদ ছফা–সিগনেচার পেইন্টিং হয়ে গেছে তার। এ যাবৎ সর্বাধিক অর্থ পেয়েছে শিল্পপতি একরামুল কবির ট্যাটনের পোর্ট্রেট করে। অয়েলের হিসাব দেড়-দুই লাখ। একরামুল কবির ট্যাটনের বিধবা পত্নী আট গুণ টাকা ক্যাশ দিয়েছিলেন। কাঠের গিফট বক্সে চকচকে নোট। টাকাটা কাজে লেগেছে। আব্বার ক্যান্সার ধরা পড়েছিল। আব্বা মারা গেছেন আট বছর আগে। আম্মা ছয় বছর আগে। তার আগে নজরুলের দুই বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। বড় বোন আসমা কানাডায় থাকে। ছোট বোন সাকিনা লন্ডনে থাকে। নজরুলের বয়স এখন তেতাল্লিশ। সে এখনো বিয়ে করে নাই। আসমা, সাকিনা ভাইয়ের জন্য মেয়ে দেখে দেখে হদ্দ হয়ে গেছে। হাল ছাড়ে নাই। সাকিনার মুখে কিছু আটকায় না, বলেছে, 'ভাই, ফ্র্যাংকলি স্পিকিং তোর কোনো সমস্যা নাই তো?'

'কী সমস্যা?'

'থাকে না কত রকম। তুই কি মেয়েদের ভয় পাস?'

'তুই কি মেয়ে?'

'আমি কি মেয়ে মানে? এটা কী ধরনের কথা বললি ভাই? তুই তো আমাকে বিরাট অপমান করলি। না না। আমার ব্লগে আমি এটা নিয়ে লিখব। দশজন দেখুক সমাজের।'

'আরে আমার কথা তো শোন। মেয়ে বলতে আমি বাচ্চা মেয়ে বলেছি। তুই কি বাচ্চা মেয়ে? ধিঙ্গি মহিলা।'

'অবজেকশন। ধিঙ্গি মহিলা! এটা তো বুলিং। এই দেখ হাতেনাতে প্রমাণ। বিয়ে না করে একা থেকে থেকে তুই জম্বি হয়ে গেছিস ভাই। জম্বিদের মতো কথা বলিস।'

এরপর পৃষ্ঠা ১৪

প্রচ্ছদ: কাজী আবুল বাসেতের চিত্রকর্ম অবলম্বনে

সাপ্তাহিক ইজেল, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড-এর একটি প্রকাশনা, ৪/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা ১০০০। বিজ্ঞাপন: ০১৭১১৫৪৭০৫০ tbs.features@gmail.com tbsnews.net

চুলটানা বিবিয়ানা

সাগুফতা শারমীন তানিয়া

আজ যা নিয়ে কথা বলব, তা কার্বন-হাইড্রোজেন-নাইট্রোজেন-অক্সিজেন-সালফারের সমন্বয়। একমাথা চুল, সতেরো শতকের কবির চোখে তা প্রিয়তমার সোনালি মাথায় জড়ানো দুর্দান্ত ধাঁধা। আবার সারামুখে অস্বাভাবিকভাবে গজিয়ে গেলে মানুষের স্থান হতো উনিশ শতকীয় সার্কাসের সাইডশোতে (রাশান ডগম্যান), বিজ্ঞানীরা মাথা ঘামাতেন–এ বিবর্তনের পুনর্মূষিকায়ন (অ্যাটাভিজম) কি না।

বোদলেয়ারের আস্ত একটি কবিতা আছে প্রেয়সীর চুল নিয়ে, ওখানে স্মৃতিরা ঘুমোয়–বিবশ এশিয়া আর লেলিহান আফ্রিকা, সুগন্ধী অরণ্য–নারকেল আর কস্তুরির গন্ধে ভরপুর, ওখানে কালো সমুদ্রের ঢেউ-জাহাজ-মাস্তুল-মাল্লা স-অ-ব, ও যেন বিলুপ্তপ্রায় কোনো দূরদেশের সংকেত। ভাবছেন এর থেকে জীবনানন্দের 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা' তো বেশি দূরে নয়। বোদলেয়ার নাকি ঐ চুলে নিজ হাতে গেঁথে দেবেন–নীলা, মুক্তো, চুনি। নজরুলের গান মনে পড়ছে না? দেব খোঁপায় তারার ফুল...বিজলী জরীণ ফিতায় বাঁধিব মেঘ রঙ এলো চুল। সিন্ধু দাদরায় রচিত একটি গানে তিনি লিখছেন–'দুলিয়ে দিয়ো দোলন-খোঁপায়, আমের মুকুল বকুল-চাঁপা'। রবিনসন জেফার্স লিখে গেছেন, 'দীর্ঘ, সরস, কমনীয়, উজ্জ্বল তরল তোমার চুল, ঐশ্বর্যময়ী...যেন সাবধানে আঁচড়িও চুল, রাত্তিরে আর সন্ধ্যায়–ওখানে জটাজালে জড়িয়ে আমার মাতাল হৃদয়।' রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'ওগো বঁধু দিনের শেষে এলে তুমি কেমন বেশে–আঁচল দিয়ে শুকাব জল, মুছাব পা আকুল কেশে।' 'কমলিকা তার সুগন্ধী এলোচুলে রাজার দুই পা ঢেকে দিলে'। কেশ-সংকেত আরও আছে আমাদের কাব্যে, 'একবেণী হিয়া ছাড়ে না মলিন কাঁথা'–সুধীন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন (কোথায় পড়েছিলাম, কালীদাসের কালে এক বেণীতে বদ্ধ চুলের মানে ছিল বিরহকাল)।

সৈয়দ মুজতবা আলী 'শবনম' উপন্যাসে শুনিয়েছিলেন বিবাহরজনীতে ইরানতুরানে বাসরঘরে স্বামী নববধূর মুখের দুই কিনারে ঢেউ খেলানো অলকগুচ্ছ/জুলফ কেটে দিত, পরে চুল গজালে স্ত্রী সেই চুল কানের পেছনে ঠেলে রাখত, জুলফের অধিকার কেবল কুমারীর। শবনমের বিবাহরাত্রির কবরীবিন্যাস মনে আছে তো? 'তার চুলের বিচ্ছুরিত আলোর মাঝখানে থাকে থাকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বচ্ছ রুপালি শামা-প্রজাপতি। মাথায় অভ্র-আবীর ছড়ানো হয়েছে অশেষ সযত্নে, এক একটি কণা করে–তিন সখী বাসর গোধূলিতে আরম্ভ করে এইমাত্র বোধ হয় কুন্তল প্রসাধন সমাপন করেছেন...তার সেই বিরাট খোঁপা জড়িয়ে একটি মোতির জাল। ঘনকৃষ্ণ কুন্তলদামের উপর স্তরে স্তরে, পাকে পাকে যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিমানীকণা ঝিলিমিলি মেলা লাগিয়েছে।' মনে পড়ে বঙ্কিমবাবুর গথিক উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা'র নায়িকার কথা, জনশূন্য অরণ্যময় দ্বীপে নায়ক নবকুমার পিছু ফিরে দেখলেন সৈকতে এক অপূর্ব নারীমূর্তি, তার চুলের রাশি গোড়ালি অবধি দীর্ঘ, যেন চিত্রপটের মতো তার শরীর ঘিরে রেখেছে। সে জিজ্ঞেস করল–'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?' চুলের রকমফের রবীন্দ্রনাথ বহুবার ব্যবহার করেছেন। 'চোখের বালি'তে আশালতার চুলে বিনোদিনীর বেঁধে দেয়া খোঁপা জটিল ইঙ্গিতমুখর, 'ঘরে বাইরে'র বিমলার কেশসজ্জা রূপকে ঠাসা। যেদিন প্রথম সন্দীপের বক্তৃতা শুনে এল, বিমলার ইচ্ছা হলো 'গ্রীসের বীরাঙ্গনার মতো আমার চুল কেটে দিই ঐ বীরের হাতের ধনুকের ছিলা করবার জন্য, আমার এই আজানুলম্বিত চুল।' যেদিন সে সন্দীপকে প্রথম দুপুরবেলা খেতে নিমন্ত্রণ করল, সেদিন সকালে মাথা ঘষে সে তার ভেজা এলোচুলে জড়িয়েছিল একটি লাল রেশমের ফিতা। বিমলা ভেবেছিল–ওটা সাদাসিধে সাজ, অথচ সাজের ভেতরকার চঞ্চলিত দীপ্তি তার বিধবা জায়ের চোখ এড়ায়নি। এড়ায়নি সন্দীপের লুব্ধ চোখও, সে-ও চিনেছে–'ঐ-যে লাল ফিতেটুকু, ছোট্ট এতটুকু, রাশি রাশি ঘষা চুলের ভিতর থেকে একটুখানি দেখা যাচ্ছে, ও যে কাল-বৈশাখীর লোলুপ জিহ্বা, কামনার গোপন উদ্দীপনায় রাঙা!' একদা স্বামী নিখিলেশের আগ্রহে বিমলা মেম রেখে খোঁপা বাঁধতে শিখেছিল, ঘাড় থেকে মাথার ওপরের দিকে চুল তুলে বাঁধা খোঁপা–যাতে চুলগুলো কালো ঊর্ধ্বমুখ শিখার মতো জ্বলে ওঠে, আর ঘাড়টা মশালের ডাঁটার মতো প্রকাশ্য হয়ে পড়ে। সন্দীপের পরামর্শে বিমলা নিখিলেশকে ডেকে যেদিন বিশেষ আবদার করল–তাদের হাটেও আর বিলিতি কাপড় আসতে পারবে না, সেদিন নিখিলেশ স্পষ্ট দেখল তার স্ত্রীর গায়ে বিশেষ সাজ, আজ সে ঐ বিলিতি খোঁপার চূড়া বেঁধেছে- তার কাছে যে খোঁপা সোহাগে-আদরে অমূল্য ছিল, যা আজ সস্তা দামে বিকোবার জন্যে প্রস্তুত চুলের কুণ্ডলী। একান্ত সঙ্গিনী

১৮৬৫ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত ফ্যাশন ম্যাগাজিন লে বোন টনে বিভিন্ন হেয়ারপিস এবং কীভাবে সেগুলিকে হেয়ারস্টাইলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তার চিত্রায়ণ।

রূপাঞ্জেল।

আজ ঋষির তপস্যাভঙ্গে প্রেরিত অপ্সরা। রবীন্দ্রনাথ চালচিত্রে বসিয়েছেন শ্রীরাধিকার গান–

‘বঁধুর লাগি কেশে আমি পরব এমন ফুল/ স্বর্গে মর্তে তিন ভুবনে নাইকো যাহার মূল।’

মার্কেসের ‘প্রেম ও অন্যান্য অপদেবতা’ উপন্যাসের কেন্দ্রের সেই সমাহিত মেয়েটিকে ভাবুন, তার বাইশ মিটার দীর্ঘ লালচে চুল শবাধার ফেটে বের হয়ে এসেছিল।

চলুন, শিল্পের কেশবান-কেশবতীদের দেখি। মাইকেল এঞ্জেলোর মোজেজের দাড়ির সেই হিল্লোল কে ভুলতে পারে, কে ভুলতে পারে লিওনার্দোর ড্রয়িং এ চুলের বিন্যাস? প্রাচীন গ্রিসে ইরেকথিয়নের পর্চে কিছু নারীদেহ আকৃতির কলাম ব্যবহৃত হয়েছিল, এদের ডাকা হতো ক্যারিয়াটিড–মাথায় থাকত পুরো এন্টাব্লেচারের ভার; মাথার পরেই তন্বী দেহের গ্রীবা- মানবদেহের সরু অংশ, এ অংশে এসে ভার নেয়ার ক্ষমতা যেন কমে না যায়, সে জন্য এই রমণীস্তম্ভগুলোর মাথার পেছনে খোদাই করা থাকত ঘনিয়ে থাকা বিশাল কেশভার। বতিচেল্লির ভেনাস আরেক কপালকুণ্ডলা। প্রির‍্যাফায়ালাইট শিল্পী রসেটির পেন্টিংয়ে, আর্ট নুভোর জনক আলফন্স মুকার পোস্টারে কেশসজ্জার ছড়াছড়ি। আর্ট নুভোর একহারা মেয়েদের সেই আলুলায়িত চুলে ফুল নয় শুধু, আইভিলতা, অলংকার, এমনকি ফলমূল গাঁথা। ফ্রিদা কালোর আত্মপ্রতিকৃতিতে কখনো তাঁর চুল ছাঁটা, কখনো খোলা, কখনো বেণীবদ্ধ সেই চুলে ফুল গোঁজা, কখনো রঙিন ফিতেয় জড়ানো। হেমেন মজুমদারের স্নানসিক্তা মেয়েদের পিঠে জড়িয়ে আছে ভেজা চুল। জয়নুল আবেদিনের স্নানশেষে চুল ঝাড়া তিন নারীর একটা পেন্টিং ছিল আমাদের হলিক্রস স্কুল লাইব্রেরিতে। জানি না আজ সেই পেন্টিং কোথায় আছে।

মনে পড়ে, রূপকথার এক রানি বরফ ছাওয়া এক পড়ন্ত বেলায় জানালায় বসে ফুল তুলছিলেন সুচ-সুতোয়, সুচ ফুটে আঙুল থেকে রক্ত বেরিয়ে এল, রানি প্রার্থনা করলেন, যেন তাঁর এমন মেয়ে জন্মায়, যার ত্বক বরফের মতো ফর্সা, রক্তের মতো লাল ঠোঁট আর জানালার ঐ আবলুস কাঠের মতো কালো চুল। কন্যার নাম স্নো হোয়াইট। আরেক কন্যার নাম র‍্যাপুনজেল, দুর্গের জানালা দিয়ে দীর্ঘ চুল বিছিয়ে দেয় সে, চুল বেয়ে দুর্গম দুর্গে উঠে আসে প্রিয় কুমার। সত্তর-আশির দশকের ছেলেমেয়ে আমরা, খুব প্রিয় ছিল সোভিয়েত সাহিত্য-পাভেল বাঝোভের ‘মালাকাইটের ঝাঁপি’, সোনালি চুলো মেয়ের গল্প, জলের ধারে বসে রইলে যার চুলের আভায় জলে সোনালি রং ধরে।

চুল নিয়ে দেশে দেশে সংস্কারের অন্ত নেই। আদি রোমক রমণীরা বিয়ের রাতে জুপিটারকে চুলের গুচ্ছ উৎসর্গ করত। নবজাতকের প্রথম মাথা মুড়ানোর পর গর্ভকেশ রেখে দিলে নাকি সৌভাগ্য দেখা দিত। টাকের সঙ্গে টাকার সম্পর্ক আছে শুনতাম। তেল পড়া, চুল পড়া ইত্যাদি বহু প্রথা আমাদের দেশে সাধারণ মানুষের ভেতর প্রচলিত রয়েছে। ছোটবেলায় শুনতাম–চুলের গোছা জানালা দিয়ে বাইরে ফেলতে নেই, আসরের পরে চুল খোলা রেখে বাইরে যেতে নেই। কিচ্ছা শুনতাম–নদীর ভেতর থেকে দীর্ঘ কেশগুচ্ছ বের হয়ে এসে রাতের বেলায় রজ্জু হয়ে পা চেপে ধরে, টেনে নিয়ে যায় নদীর গহ্বরে। শুনতাম, হযরতবাল দরগাহ শরিফে রক্ষিত মহানবী (সা.)-এর চুল-দাড়ি চুরির ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গে এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হবার ইতিহাস। ডাকের বচনে আছে–চিরলদাঁতী পিঙ্গল কেশ, ঘুরবে কন্যা দেশবিদেশ। ...অল্প কেশ ফুলাইয়া বান্ধে...বলে ডাক এ নারী ঘর উজাড়। হায়, শর্মিলা ঠাকুরের মৌচাকের মতো বিশাল বুঁফ দেখলে না জানি ডাক কী বলতেন, এখন সারা দুনিয়াতেই মেয়েরা অল্প কেশ ফুলাইয়া সজ্জা করেন। অবনীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন, তুষতুষলি ব্রত করতে মেয়েরা ‘আসনপিঁড়ি, এলোচুল’ হয়ে বসত, যেমন বসত মেক্সিকোর মেয়েরা–শস্য যেন এই এলোকেশের মতো গোছা গোছা হয় এই কামনায়। প্রিয়জনের চিহ্ন হিসেবে ইউরোপে একগুচ্ছ কেশ কেটে নেবার চল ছিল, চুলের গুচ্ছের মাধ্যমে জাদু করবার রীতি চালু ছিল মধ্যযুগে, সেই রীতির নিরিখে এর মানে হচ্ছে–যাকে মেয়েটি চুলের গুচ্ছ উপহার দিচ্ছে, সে তার ওপর জাদু খাটানোর অধিকার রাখে। আঠের শতকের কবি কাউপার চেয়েছিলেন প্রিয়া ডেলাইলার চুলগুচ্ছ। ভিক্টোরীয় আমলে মৃত প্রিয়জনের বা সন্তানের এক গোছা চুল কেটে রেখে দেবার চল ছিল, সেই চুল লকেটে-ব্রেসলেটে-ব্রুচে পুরের মতো ভরে রাখা হতো, প্রিয় মানুষের নিশানা।

দীর্ঘ সময় ধরে সাজানো কেশবিন্যাস ছাড়া প্রাচীন রোমের নারীদের ভাবা যেত না। টুটুলাস, নডি, ফ্ল্যাভিয়ান ও আঁতোয়ান সেকালের ফুলাইয়া বান্ধার নানান নমুনা। আঠের শতকের ইউরোপের বারোক এবং রকোকো পিরিয়ডের নারীরা কেশ ফুলাইয়া বান্ধার চরমে পৌঁছাল। চুলে মাড় দিয়ে পাউডার বুলিয়ে শাদা করা হতো, কেউ কেউ গোলাপি, বেগুনি বা নীল রং করতেন। ঘোড়ার চুল-উল-তার পেঁচিয়ে এমন বিশাল কেশসজ্জা করা হতো যে নারীরা সপ্তাহের পর সপ্তাহ চুল ভেজাতেন না, স্নান করতেন না। ‘যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভেজাবো না’ গোঁসাই রসরাজের পল্লীগীতিই শুধু নয়, ওটা রকোকো জমানার মূল সুর। ফরাসি বিপ্লবের পর অবশ্য সেই পাহাড় লুকানো কেশের আড় ভাঙল। ভিক্টোরিয়ান আমলে এল কপালকুণ্ডলার যুগ, অর্থাৎ অত্যন্ত দীর্ঘ চুল রাখবার প্রচলন, ১৫ বছর বয়স থেকে মেয়েদের চুল কবরীবদ্ধ। চুলের ঢেউ এবং রোল করার জন্য ব্যবহৃত হতো গাছের আঠা, হেয়ারস্প্রের যুগ আসতে তখনো ঢের দেরি। প্রথম মহাযুদ্ধের ডামাডোলে কেশবিন্যাস নিয়ে মাথা ঘামানোর ফুরসত অকল্পনীয় হয়ে উঠল। মহাযুদ্ধের পর এল ইটন ক্রপ, শার্প বব, পিক্সি কাট। ১৯২০-এর শেষাশেষি স্যালন এসে গেল মেয়েদের আওতায়, চুলের স্টাইলিং সহজলভ্য হলো।

চুল আদিবাসীদের ভেতর সামাজিক পদমর্যাদা, বীরত্ব, বয়স, বিয়ে, সন্তানধারণকাল, ধর্ম ও গোত্রের সংকেত, সে অস্ট্রেলিয়ার হোক কি আফ্রিকার কি আমেরিকার। মধ্য আফ্রিকার মাসাই এবং সাম্বুরুরা শৈশবে চুল রাখে মোরগঝুঁটির মতো, যৌবনে যোদ্ধার

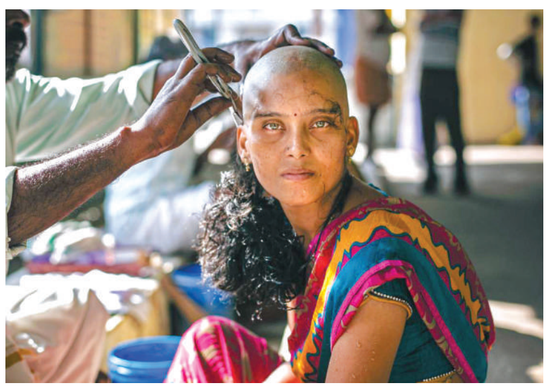

এক হিন্দু নারী তার মাথা ন্যাড়া করছেন থিরুথানি মুরুগান মন্দিরে। থিরুথানি, ভারত। এই চুল মন্দিরে দান করা হবে, পরে তা প্রক্রিয়াজাত করে বৈশ্বিক বাজারে বিক্রি করা হবে।

‘মা, আমি যখন বড় হব, তখন কি আমার তোমার মতো সুন্দর লম্বা চুল হবে?’ মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে, মাকে হেয়ারব্রাশ ব্যবহার করতে দেখে। এডওয়ার্ডস’ হারলেনের।

বেশ নেয় সে–পিঠঢাকা দীর্ঘ কেশে অসংখ্য বিনুনি করে, চুলে মাখে মেটে লাল অকার আর গবাদিপশুর চর্বি, যে যোদ্ধা সিংহ মেরেছে, সে পরে কেশরের তৈরি চুলের গয়না। মুইলা গোত্রের মানুষরা চুলে জটা পাকাতে ব্যবহার করে গোবর, কাদা আর শঙ্খচূর্ণ। সনাতনধর্মীদের মতোই মাসাই পরিবারপ্রধান পিতার মৃত্যুতে মাথা কামায়। বব মার্লি বা হুপি গোল্ডবার্গের মাথায় ড্রেডলকস বা জটা দেখি, সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে, যেমন সম্পর্ক আছে অ্যাফ্রো চিরুনির সঙ্গে কালো মানুষের স্বকীয়তার।

এ বঙ্গে ধূপের সুগন্ধী ধোঁয়ায় চুল শুকাতো মেয়েরা। খোঁপার রকমফের ছিল, হাতখোঁপা, বাগানখোঁপা, বিড়েখোঁপা, চুঁড়োখোঁপা, ঝুলন বা দোলনখোঁপা, এলোখোঁপা, ফিরিঙ্গিখোঁপা। রতন কাহারের ঝুমুর গান–বড়লোকের বিটি লো, লম্বা লম্বা চুল, এমন খোঁপা বেন্ধে দেব লাল গ্যান্দা ফুল; ‘আমার সঙ্গে দেখা হবে বাবুর বাগানে’ লাইনে বাবুবিলাস-বাগানবাড়ি-পতিতাপল্লিতে চালান হয়ে আসা হতভাগ্য মেয়েদের জীবনের কত সংকেত। অথচ গায়ে হলুদে এ গান গাইতাম নবীন বয়সে, আমার জেদি বন্ধু গাইত এ গানেরই কলি–যা কেনে কোথা যাবি ওরে ও যাবি, দুদিন পরে আমার ছাড়া আর কার বা হবি।

কুন্তলীন, নিদ্রাকুসুম, জবাকুসুম আর লক্ষ্মীবিলাস–ওসব কেশতৈল আমরা নামেই চিনি। কেয়ো কার্পিনের ফিকে জলপাই সবুজ তেল নিউমার্কেটে পাওয়া যেত। বাড়িতে আসত রিগার্ডের হাঁসমার্কা নারকেল তেলের সবুজ কাচের শিশি, আসত তেজগাঁওয়ের ‘জাগরণী’র নারকেল-পেষা খাঁটি তেল, শীতকালে রোদে দিয়ে গলাতে হতো। কাচের ছোট্ট জারে বাসন্তী রঙের তিব্বত পমেড–চুলের যত্নেও নাকি চমৎকার। ‘এপি পনেরো’ কেশতেলের বিজ্ঞাপনে একটা ছোট্ট অ্যানিমেশন ছিল, চুল পড়ছে বলে রাজকন্যা কাঁদছে, এপি পনেরো মাখছে, অতঃপর সখীরা তিনজন মিলে কন্যার দীর্ঘ কেশ পিছু পিছু বয়ে নিয়ে চলেছে। জিঙ্গেলটা আমার এখনো মনে আছে–রূপবতী সখী তোরে কেশবতী করে দেবে এপি পনেরো কেশতেল। চুলের যত্নে চলত জবার কলি-একাঙ্গী-সোন্দামূল তেলে জারিয়ে রাখা, চলত মহাভৃঙ্গরাজ বা কেশুতপাতা। শ্যাম্পু করলে যদি চুল পড়ে যায় সেই ভয়ে চলত সরিষার খৈল আর ভিজিয়ে রাখা রিঠা দিয়ে চুল ধোয়া। লোকে মাথা ঘামাত–রিকশাওয়ালাদের টাক পড়ে না–কাজের বুয়াদের মাথা ভরা চুল, তবে কি গভীর চিন্তাভাবনার সঙ্গে চুল পড়ার সম্পর্ক আছে? নাকি কায়িক শ্রমের সঙ্গে চুলের সম্পর্ক আছে?

চুল নিজেই কেবল শোভা নয়, শিরশোভা হিসেবে দেশে দেশে চল রয়েছে চুলের গয়নার। খোঁপায় গোঁজার চিরুনি পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো, অ্যাফ্রো চিরুনির

বিজ্ঞাপন, ১৮৯০।

বয়স ছয় হাজার বছর। চুলের পিন বা কাঁটার ইতিহাস আরও পুরোনো, যিশুর জন্মের ত্রিশ হাজার বছর আগেও এর চল ছিল। উইলেনডর্ফের আদি ভেনাস বা নিওলিথিক ভেনাসের চুলেও ছিল পুঁতি-গাঁথা বিন্যাস। অজন্তার গুহায় ফ্রেস্কোর নারীদের চুলে কত না অলংকার। ডায়াডেম আর মুকুট পরত প্রাচীন গ্রিস ও রোমের রাজপরিবার। রেনেসাঁ আমলের অভিজাত নারীরা পরতেন সোনা-হাতির দাঁত-কচ্ছপখোলার কাঁটা। টিয়ারা এল আঠারো শতকে। ভিক্টোরীয় এবং জর্জীয় আমলে ফ্যাশন হলো দুর্মূল্য হিরে-জহরতখচিত বারেট বা হেয়ারক্লিপের। মুঘল নারীরা পরতেন ঝাপটা-পাশা-ঝুমর, টিকা, টায়রা, সিঁথিপাটি, মাথাপাটি। দক্ষিণ ভারতীয় দেবদাসীরা চুলের বেণীতে পরতেন জাদুনাগম-নাগিনীর মতো অলংকার, নববধূ ও নৃত্যশিল্পীরা এখনো পরেন। রাজস্থানী মহিলারা পরেন রাজপুতি বোরলা, মহারাষ্ট্রের নববধূ পরেন মাডোরিয়া, বাংলাদেশের নববধূ পরেন টিকলি ও টায়রা। উদ্দেশ্য কপালের/অদৃষ্টের ওপর কুদৃষ্টি এড়ানো। একসময় পুরান ঢাকার মোষের হাড়ের চিরুনি বা কাঁকই ছিল প্রসিদ্ধ। এখনো আমরা চুলে কত কী পরি, রুপার ঝুনঝুনি দেয়া খোঁপার কাঁটা, ডোকরার কাঁটা, খোঁপায় গুঁজবার চিরুনি।

বেশি দিন আগের কথা নয়, কনে দেখতে গিয়ে বাড়ির মহিলারা মেয়েটিকে চুল খুলতে বলতেন, ঘরে বানানো কালো দড়ি আর ফিতে দিয়ে বেশ ফুলিয়ে কবরী রচনা করার প্রচলন ছিল বলে ওঁরা চুল খুলিয়ে দেখতেন আসল চুল কতখানি। আমার এক দূরসম্পর্কের নানিকে মামার জন্য কনে খুঁজতে গিয়ে বলতে শুনেছিলাম–দেখি তো মা, ঘোমটা খোলো দেখি, নানির চুল পিন্দা আইছ নাকি নিজের চুল। ভাবা হতো চুলের

উনিশ শতকের গোড়ার দিকের এক পুরুষ হেয়ারড্রেসার ও এক ফ্যাশনদুরস্ত নারী। চিরুনি, কাঁচিসহ তার চুল পরিচর্যার সরঞ্জাম কোটের পকেটে।

১২টি ছোট ছোট চিত্রকল্প। নাপিতের দোকানে যাওয়ার আনন্দ এবং যন্ত্রণা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দুই মহিলা হেয়াড্রেসারও আছেন।

উনিশ এক শান্ত আরামদায়ক নাপিতের দোকান। অপেক্ষারত গ্রাহক এবং নাপিত খোশমেজাজে গল্পরত। আগ্রহ এবং আনন্দের সঙ্গে এমনকি যিনি শেভ করাচ্ছেন তিনিও প্রশংসা শুনছেন। রক্ষণশীল ও অত্যন্ত জনপ্রিয় সানডে পেপার, ১৮২০ সাল।

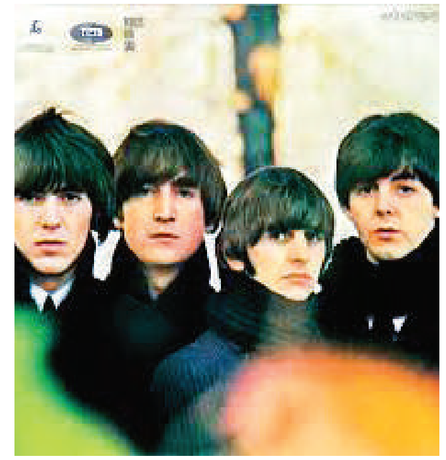

বিটলস সদস্যদের হেয়ারস্টাইল।

ওমর শরীফ, ডক্টর জিভাগো।

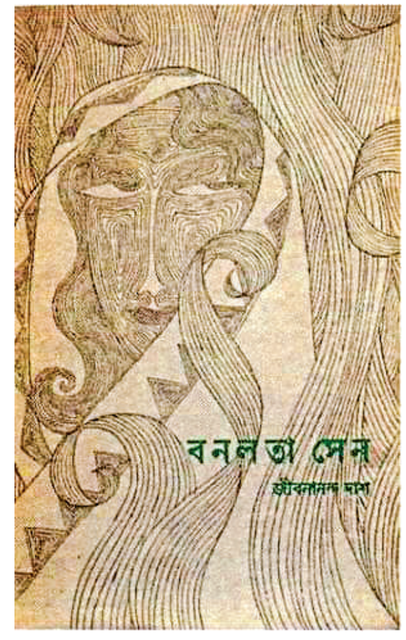

সত্যজিৎ রায়ের আঁকা বনলতা সেনের প্রচ্ছদ।

সঙ্গে উর্বরতার সম্পর্ক জবরদস্ত। চুল বড় প্রগলভ, প্রেমিকের চোখে–কবির চোখেই শুধু নয়, ডাক্তারের চোখে, ফরেনসিক চোখে। চুল বলে দেয় কার অ্যান্টি মুলেরিয়ান হরমোন কতটুকু–কার কর্টিসলের মাত্রা কত, কে হাইপোথাইরয়েডিজমে ভুগছে, কার পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিন্ড্রোম আছে। ফরেনসিক অ্যানালিসিসেও চুল বাঙময়–বলে দেয় লাশ কার, সে কোন জাতের, কোন গোত্রের, কোন লিঙ্গের, কোন বিষক্রিয়া ঘটেছে তার শরীরে, কেশমূল থেকে ডিএনএর তথ্য পাওয়া যায়।

চুল বড় চপলা। মুরাসাকি শিকিবুর উপন্যাসে দেখা যায়–তখনকার অবরোধবাসী জাপানে পর্দাপ্রথার কড়াকড়ি ছিল, জাপানি নারীর চুলের আভাস পুরুষকে ভীষণ যৌন ইন্ধন জোগাত। ঘোমটার চল ছিল প্রাচীন রোমেও, মার্জিত নারীকে পাতলা কাপড়ে বা কারুকার্যময় ব্রোকেডে চুল ঢাকতেই হবে, পরে মধ্যযুগ এবং রেনেসাঁ আমলেও এই চল দেখা যায়। ইতালীয় রেনেসাঁ পেইন্টিংয়ে নারীর চুল খোলা বা বেণীবদ্ধ–তাতে কপাল-ঢাকা ঘোমটা। ইংল্যান্ডে টিউডর আমলে নারীরা সর্বদা মাথা ঢেকে রাখত। রাজা অষ্টম হেনরির প্রথম স্ত্রী ক্যাথরিনের যুগে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা পুরো মাথা গেবল হুডের কড়া ভাঁজের কাপড়ে আর মখমলে ঢেকে নিত, অ্যান বোলিন (রাজার পরবর্তী স্ত্রী) হেনরির চোখে পড়েছিলেন মাথার ফরাসি হুডের কারণে–যে ঘোমটায় কপাল আর সিঁথি দেখা যেত। অ্যানের মৃত্যুদণ্ডের পর রাজার তৃতীয় স্ত্রী হলেন লাজুকলতা জেন সিমোর, ফিরিয়ে আনলেন কড়া ঘোমটার গেবল, জেনের মৃত্যুর পর ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি আবার ফিরে এল ফ্রেঞ্চ হুড, তদ্দিনে কপাল-চুলের বেশ খানিকটা দেখানোর ফ্যাশন জনপ্রিয় হয়েছে। অর্থোডক্স ইহুদি মেয়েরা বিশ্বাস করে, সজীব চুল দেখবার অধিকার কেবল স্বামীর, নির্জীব চুল জগত দেখতে পারে, তাই তারা পরচুলা এবং স্কার্ফ পরে। মুসলিম বিশ্বে হিজাব-নেকাব প্রচলিত। খ্রিষ্টান মেয়েরা এখনো বহু দেশে এবং সংস্কৃতিতে মাথা ও চুল আবৃত রাখেন, ইস্টার্ন ক্রিশ্চিয়ানিটির চার্চে এবং অর্থোডক্স ক্রিশ্চিয়ানদের ভেতর মেয়েদের মাথা আবৃত রাখার চল রয়েছে। শুধু যে যুদাইজম, ক্রিশ্চিয়ানিটি এবং ইসলামে হাজার বছর ধরে মার্জিত এবং ধার্মিক নারীর মাথা আচ্ছাদনের কথা বলা হয়েছে, তা-ই নয়, সেকুলার রীতিরেওয়াজেও এর উল্লেখ রয়েছে–এই যেমন প্রাচীন মেসোপটেমীয়, গ্রিক এবং পার্সিয়ান রাজত্বে সম্ভ্রান্ত নারীর আবৃতমস্তকে থাকবার রীতি ছিল। এসব ঘোমটা সাধারণত সুতি বা লিনেনের হতো, ধনী পরিবারের নারীরা সিল্ক ও মখমলের ঘোমটা দিত।

চুল নিয়ে পুরুষের বেলায়ও বিধিনিষেধ কম নেই। পুরুষের বাবরি চুল রাখতে নাকি ইসলামে নিষেধ নেই, যেমন নেই যুদাইজমে, যদিও ধর্মভীরু ইহুদিরা পুরুষের চুল লম্বা রাখা পছন্দ করে না। এমনকি বহু ধার্মিক খ্রিষ্টান একালেও বিশ্বাস করে, পুরুষ দীর্ঘ কেশ রাখলে পাপ হয়।

এবার আসি কেশরঞ্জনীর প্রসঙ্গে। খ্রিষ্টপূর্ব ২১৭৭-তে এসিরীয়দের কিছু পাকপ্রণালিতে কেশরঞ্জক তৈরির ইতিহাস পাওয়া যায়। এবার্স প্যাপিরাস নামের প্রাচীন মিসরীয় পুস্তকে পাওয়া যায় ভ্রু আর কেশ রঞ্জনের উপায়। ষাট-সত্তরের দশকে চুলে রং করার ফ্যাশন বেদম বেগে শুরু হয়, চেহারা রৌদ্রচুম্বিত দেখাবার জন্য হাইলাইট আর ফ্রস্টিং চালু হয়, ব্লিচ ব্লন্ড এবং নিয়ন হেয়ার জনপ্রিয় হয় পাংকদের ভেতর। কেশরঞ্জনে সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের কেউ টেক্কা দিতে পারবে না। ব্লন্ড হিসেবে চিরপরিচিতা মেরিলিন মনরোর সোনালি চুল ডাই করা, লালচুলো হিসেবে চিরপরিচিতা নায়িকা রিটা হেওয়ার্থের কালো চুল লাল ডাই করা। চুলের আসল রং বদলে ব্লন্ড হয়েছিলেন এমন নায়িকাদের ভেতর আছেন ম্যারিয়ন ডেভিস, জোন ক্রফোর্ড, ক্যারল লোমবার্ড, বেটি গার্বল এমনকি গ্রেটা গার্বোও। ডরোথি মেলন আর এলেনর পার্কার উভয়েই চুল ব্লন্ড করার পর থেকে সিনেমার দুষ্টা স্ত্রীলোকের রোল করতে শুরু করেছিলেন, ক্যারিয়ারের পালে হাওয়া লেগেছিল। উল্টোটা ঘটেছিল জোন বেনেটের বেলায়, চুল সোনালি থেকে ব্রাউন করেছিলেন–ক্যারিয়ার বদলেছিল।

ব্লন্ড বা সোনালিচুলোদের বুদ্ধিহীনতা নিয়ে অনেক বাজে জোক আছে, এখানে বলা হলো না। চুলের ডাই নিয়ে পুরোনো আনন্দমেলায় একটা দুর্দান্ত ছোট গল্প পড়েছিলাম। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের একটি যুবক কেমিস্ট হতে চেয়েছিল, ভাগ্যক্রমে তাকে পারিবারিক ব্যবসায় তথা সেলুনে চুল ছাঁটবার কাজ নিতে হয়। একদিন সন্ধ্যায় দোকান বন্ধ করার সময় এক খদ্দের এসে উপস্থিত। সে চুল ছাঁটবে এবং রং করাবে। খদ্দেরের চেহারা দেখে যুবকের সন্দেহ হয়। কয়দিন ধরেই রেডিওতে ফেরারি আসামির বর্ণনা শুনছিল যুবক, খুনির বাঁ হাতের মধ্যমা তর্জনীর চেয়ে ছোট। চুল কাটবার জন্য সে লোকটার গায়ে চাদর মুড়ে দিয়েছে, হাতের আঙুল খেয়াল করবে কী করে! যুবক খদ্দেরের চুল ভিজিয়ে কাটতে শুরু করে, ইচ্ছে করে কিছু কাটা চুল খদ্দেরের বাঁ কানে লেপ্টে রেখে পিছু ঘোরে। নাপিতের ঘরজোড়া আয়নায় যুবক দেখতে পায় খদ্দের কানে লেপ্টানো ভেজা চুল ফেলে দিল, লোকটার মধ্যমা খাটো। ভয়ে গা শিরশির করে ওঠে তার। কিন্তু সাহস হারালে চলবে কেন। মনোযোগ দিয়ে সে চুল ছাঁটে, ডাই করে। খদ্দের পয়সা চুকিয়ে দিয়ে চলে গেলে যুবক পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ আসামিকে সহজেই খুঁজে পায়; কারণ, কেমিস্ট হতে চাওয়া যুবক এমন কায়দায় লোকটার চুল ডাই করে দিয়েছিল যে আধঘণ্টার ভেতর লোকটার চুলের রং সবুজ হয়ে যায়।

কপালে চুলের ঘের নিয়েও কত জ্বালা। হলিউডে কলম্বিয়া পিকচার্সের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবার পর রিটা হেওয়ার্থকে একটি দীর্ঘ যন্ত্রণাদায়ক ইলেকট্রোলাইসিসের

মেরিলিন মনরো অনন্য চুলে।

অধ্যায় সইতে হয়েছিল, রিটার শ্বেতাঙ্গিনী চেহারা তৈরির জন্য তাঁর চুলে ঘেরা 'হিস্পানিক কপাল'কে শুধরে কেশমূল চিরতরে উৎপাটন করে কপাল আয়ত করা হয়। 'ডক্টর জিভাগো'তে অভিনয় করবার সময় চরিত্রের প্রয়োজনে ওমর শরীফের ছোট্ট 'আরবী কপাল' থেকে ওয়াক্সিং করে চুল তুলে রুশী কপাল করে নিয়েছিলেন ডেভিড লিন। তবে রিটার বদলটা স্থায়ী। উৎপাটনের বিপরীতে বপন, হেয়ার ট্রান্সপ্ল্যান্ট/গ্রাফটিংয়ের পন্থা এসেছে এখন, অ্যানেসথেসিয়া দিয়ে করা হয়, হেয়ার সার্জনরা নাকি একটি চুল বুনতে আট ডলার করে নেন।

পর্দায় যাদের বুদ্ধিমত্তা আমাদের চমকে দেয়, তার কেরদানি স্ক্রিনপ্লে রাইটার-পরিচালকের। পর্দায় যাদের সুন্দর স্বাস্থ্যের দীপ্তি আর একমাথা চুল আমাদের বিস্মিত করে, তাদের রূপরক্ষা-স্বাস্থ্যরক্ষার কঠিন নিয়মানুবর্তিতার পাশাপাশি একটি জাদুকরী বস্তু আছে, তার নাম পরচুলা। পরচুলার রকমফের অনেক-লেসফ্রন্ট, হিউম্যান হেয়ার, সিন্থেটিক। অভিনেতারা ছাড়াও আদালতে পরচুলা পরেন ব্যারিস্টাররা, এ ক্ষেত্রে পরচুলা পরাটা শুধু সপ্তদশ শতক থেকে চলে আসা রীতিই নয়, পরচুলা ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রকাশ, এজলাসে চাক্ষুষ পার্থক্য সৃষ্টির উপকরণ। আগে ঘোড়ার চুলে বোনা কাঁধঢাকা পরচুলা পরার রেওয়াজ ছিল, এখন পরা হয় বব-গোছের পরচুলা, হেম্প দিয়ে বোনা ভিগান পরচুলাও পাওয়া যায়।

পুরোনো সোনালি হলিউডের স্টারদের মধ্যে জন ওয়েইন, জিমি স্টুয়ার্ট, ফ্রেড অস্টেয়ার, ডেভিড নিভেন, হামফ্রে বোগার্ট, বার্ট ল্যাংক্যাস্টার, পিটার কুশিং পরচুলা এবং আংশিক-পরচুলা বা 'টুপেয়' পরতেন। ক্রিস্টোফার লি পর্দায় এবং পর্দার বাইরে সর্বত্র পরতেন পরচুলা। ইউল ব্রাইনার চির টেকো, চরিত্রের প্রয়োজনে কখনো পরচুলা পরেছেন নতুবা সব সময় টাকমাথা নিয়েই অভিনয় করেছেন। জন ট্রাভোল্টা, শন কনোরি, জুড ল, ড্যানিয়েল ক্রেগ পরচুলা পরেন। ডলি পার্টন, র‍্যাকেল ওয়েলচ থেকে টায়রা ব্যাংক্স, নায়োমি ক্যাম্পবেল, কিরা নাইটলি কে পরেন না পরচুলা! কেটি প্রাইস, কিম কারদাশিয়ান হেয়ার এক্সটেনশন ছাড়া কাউকে দর্শন দেন না। জেনিফার লোপেজের বাড়িতে নাকি একটি কামরা বোঝাই পরচুলা এবং হেয়ারপিস। গায়ক-গায়িকারাও পিছিয়ে নেই–এল্টন জন, লেডি গাগা, কেটি পেরি, ভিক্টোরিয়া বেকহাম কিংবা রিহানা।

বলিউডে 'পাকিজা'র নায়ক রাজকুমার চিরদিন পরচুলা পরেছেন। একবার তিনি মালা সিনহাকে বলেছিলেন তাঁর হোটেলের সুইমিংপুলে এসে সাঁতার কাটতে, মালা সিনহা কড়া জবাব দিয়েছিলেন–পুলে রাজকুমারের পরচুলা যখন ভেসে যাবে, তখন কী হবে! শর্মিলা ঠাকুরের সঙ্গে একই গাড়িতে কোথাও যাচ্ছিলেন রাজকুমার, সারা পথ তিনি জানালা খুলতে দেননি যদি বাতাসে পরচুলা উড়ে যায়, যদিও সেই পরচুলা রাজকুমারের মাথায় স্কার্ফ দিয়ে বাঁধা। অমিতাভ বচ্চন আশির দশকে 'কুলী' সিনেমার সময় থেকে আধটেকো, তখন থেকেই পরচুলা পরতেন। ফিরোজ খান, রাকেশ রোশন, সানি দেওল, অক্ষয় খান্না, জন অব্রাহাম, সঞ্জয় দত্ত, আদিত্য পাঞ্চোলি, বিবেক ওবেরয়, হালের রনবীর কাপুর... বলিউড অন্তহীন পরচুলার রাজত্ব। শোনা যায়, নায়ক ঋতিক রোশন প্লেটলেট রিচ প্লাজমা ট্রিটমেন্ট নেন, মাথায় মিনোক্সিডিল মাখেন, ওঁরটা পরচুলা নাকি গ্রাফটিং এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

রাজ্জাক, ববিতা, নূতন, অঞ্জু, সোহেল রানা, রুবেল, আনোয়ার হোসেন–ছায়াছন্দে যাঁকেই দেখতাম, তাঁরই মাথায় পরচুলা! 'উন্মাদ পত্রিকায়' একবার কার্টুন এল–জাম্বুর মনে দুঃখ এই যে তাঁর স্ত্রী তাঁর চকচকে টাকটাকে প্রায়ই হাত-আয়না হিসেবে ব্যবহার করেন। পরচুলা তৈরি এখন বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে কুটিরশিল্পের আকার নিয়েছে।

চুলের গল্প আসলে র‍্যাপুনজেলের কেশের চেয়ে দীর্ঘ। মিনিয়েচারশিল্পীর এক-বাল তুলি কিংবা সেবল ব্রাশের সূক্ষ্ম তুলিমুখ তৈরিতে যে রোমশ প্রাণীরা জীবন দিল, আজও যত প্রাণী ফারট্রেডিংয়ে খুন হয়, সেসব অবধি গল্প গড়িয়ে যেতে পারে। মুক্তিযুদ্ধে যত শহীদ-বীরাঙ্গনার দীর্ঘ চুল পাকিস্তানি আর্মি সিলিং-ফ্যানের সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়েছিল, তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে এইখানে চুপ করলাম, বাকিটা লেখা আছে অশ্রুজলে। ●

পরচুলা পরা ইউরোপের অভিজাত ও রাজন্যবর্গীয়রা।

ফ্রান্সের লুইয়ের বিবাহ অনুষ্ঠান, পরচুলা পরা তখন অভিজাতের প্রধান ফ্যাশন।

পরচুলা

সৌন্দর্যে বদল এনেছে, পাল্টে দিয়েছে সমাজ

সৈয়দ মূসা রেজা

চিঠি লেখার আবদার প্রেমিকার কাছে জানিয়ে মহাদেব সাহা লিখেছিলেন, 'চুলের মতন কোনো চিহ্ন দিও বিস্ময় বোঝাতে যদি চাও..।' অন্যদিকে যুগ যুগ ধরে কুচবরণ কন্যার মেঘবরণ কেশের বর্ণনা থেকে শুরু করে বহু উল্লিখিত বনলতা সেনের 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা' পর্যন্ত নানা উপমায় অলংকৃত হয়েছে কেশদাম। 'মেঘনায় ঢল' কবিতায়ও পানিতে ভাসমান চুল এসেছে শোক বার্তার ভগ্নদূত হয়ে।

দেখ্ দেখ্ দূরে মাঝ-দরিয়ায়,
কাল চুল যেন ঐ দেখা যায়–
কাহার শাড়ির আঁচল-আভাস সহসা উঠিছে ভাসি?
আমিনারে মোর নিল কি টানিয়া মেঘনা সর্বনাশী।

প্রেমের অনুনয় ছেড়ে সৌন্দর্যের জগতে যদি পাখা মেলি কবির বলা, 'চুলের মতন সেই চিহ্ন' কী হয়ে উঠবে পরচুলা! নাকি চুলেরই প্রতিরূপ! পরচুলা নিয়ে কথা পাড়তে গিয়ে চুল নিয়ে বাউল গায়কের মাথার আউলা কেশের মতোই এলোমেলো কিছু কথা মনে এল।

এ কথা সবাই জানেন, সৌন্দর্যের জগৎ প্রেমের পৃথিবীর মতোই জটিল। নানা রহস্যের ঘেরাটোপে মোড়া। আবার কারও কারও কাছে তা নেহাতই ফাঁপা বা শূন্যতায় ভরা বিশ্বও মনে হতে পারে। তা যা-ই হোক না কেন, ফ্যাশন এবং সৌন্দর্যের ধারা প্রায়ই রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ঘটনাবলির সাথে জড়িয়ে যায়। আর আমাদের ইতিহাসের চাক্ষুষ দলিল হিসেবে কাজ করে। পরচুলা, কৃত্রিম চুল বা উইগ মানুষের সৌন্দর্যের ইতিহাসে অংশ। হয়তো ছোট একটি অংশ। তা হলেও বিভিন্ন কালে পরচুলা বা উইগের জনপ্রিয়তা সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের, রুচির আবর্তনের এবং সামাজিক আন্দোলনের প্রতিফলন রয়েছে। পরচুলা মানুষের সৌন্দর্য বোধ এবং আধুনিক সমাজ জীবনকে নানা রূপে, নানা ভাবে প্রভাবের ছায়াতলে নিয়ে গেছে। স্টাইল এবং ফ্যাশনের চঞ্চল পরিসীমার পরিবর্তন ঘটছে। কিন্তু পরিবর্তনের স্রোতকে ধারণ করেও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে টিকে রয়েছে পরচুলা বা উইগ।

প্রাচীন সভ্যতার দিনগুলো থেকে যাত্রা শুরু করে হলিউডের রূপ-যৌবনের মোহনীয় লীলাময়ী জগৎ পর্যন্ত সব স্তরেই ফ্যাশনকে গতিময় করে তুলেছে পরচুলা। ব্যক্তিত্বের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে।

মিসরীয় রাজপরিবারের জটিল 'জালিজা বোহো বিনুনি' কিংবা ইউরোপীয় অভিজাতদের শিরে শোভাবর্ধনকারী সূক্ষ্ম জালিজা বোহো পরচুলা বা উইগ–যার কথাই বলা হোক না কেন, সবার রয়েছে নিজস্ব গল্প। ইতিহাসের রঙিন যাত্রাই ফুটে উঠেছে পরচুলার এই কালজয়ী অভিযানে।

প্রাচীন মিসর এবং গ্রিসে পরচুলা নিছক ফ্যাশন হিসেবে পরা হতো না। পরচুলার মধ্য দিয়ে সামাজিক মর্যাদা এবং ক্ষমতাও নির্দেশনাও দেওয়া হতো।

মিসরের ফারাওদের পরচুলা তাদের ঐশী সংযোগ এবং মহিমাকে ইঙ্গিত করত। একইভাবে গ্রিক অভিজাত শ্রেণির মাথার কোঁকড়ানো এবং ঘন পরচুলা তাদের বিত্ত-বৈভব এবং সমাজে প্রভাবশালী অবস্থানের প্রকাশ ঘটাত।

সৌন্দর্যের আলাপচারিতা উঠলেই ঐতিহাসিকেরা প্রাচীন মিসরকে আলোচনায় বৃত্তে নিয়ে আসতে পছন্দ করেন। তাদের দৃষ্টিতে সৌন্দর্যের প্রতীকী এবং প্রগতিশীল উদাহরণ হয়ে উঠেছে মিসর। প্রাচীন মিসরীয়রা কেবল কাজল বা আইলাইনারই উদ্ভব করেনি। বরং পরচুলার চলও শুরু করেছিল।

এরই মধ্যে সবাই বুঝতে পারছেন। সেকালে পরচুলা তৈরিতে ব্যবহার হতো তন্তু এবং পশম। এতে মানুষের চুলও ব্যবহার হতো। আজকের বাজারে যেসব অতি উঁচু মানের পরচুলা পাওয়া যায় তার সাথে দূর অতীতের পরচুলার তুলনা চলবে না। পরচুলা ব্যবহার করে রূপের বিবর্তন ঘটেছে। সৌন্দর্যের সংজ্ঞা বদলে গেছে। কিন্তু মূল বার্তার, সৌন্দর্য মানেই শক্তি, পরিবর্তন ঘটেনি।

প্রাচীন গ্রিসের নাট্যশিল্পে পরচুলার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। লব-কুশীরা নানা চরিত্রে অভিনয়ের জন্য বিভিন্ন জাতের পরচুলা পরতেন। পরচুলার বদৌলতে দেবতা, নায়ক বা সাদামাটা মানুষের চরিত্র অভিনয়কে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতেন তারা। নাটক এভাবে দর্শকের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠত। পরচুলার জটিল নকশা গ্রিক সংস্কৃতির শিল্পদক্ষতা এবং দৃষ্টিগ্রাহ্য (ভিজ্যুয়াল) কাহিনি বলার ক্ষেত্রে ভালোবাসা ও পেশাদারত্বকে স্পষ্ট করে তুলত।

মধ্যযুগের ইউরোপে বিত্তশালী এবং বিত্তহীনের মধ্যে বিভাজন চিহ্ন হয়ে উঠেছিল পরচুলা। বিশুদ্ধ পানির প্রকট অভাব ছিল অতীতের সে যুগে। স্বাস্থ্যবিধিও মানা হতো না। অনেক সময় মানার উপায়ও ছিল না। ফলে চর্মরোগ চুলকানির হাত থেকে নিস্তার পেত না সেকালের ধনীরাও। অন্যদিকে ধনীদের চুলেও চলত উকুনের রাজত্ব। এমনি এক দশায়, নিজেদের ক্ষীণ বা লুপ্তপ্রায় চুল ঢাকতে চাপাতেন বড় এবং জটিল ও বাহারি নকশার পরচুলা। পরচুলা আকারে যত বড় এবং চোখে পড়ার মতো হবে, ততই জনপ্রিয় হয়ে উঠত। ইউরোপের আদালতে পরচুলা শুধুই ফ্যাশনের বয়ান হয়ে উঠত না। পাশাপাশি সামাজিক নানা শ্রেণি, পদ এবং পদবির ঠিকুজিও বাতলে দিত। ইউরোপীয় রাজদরবারে পরচুলা পরার ঐতিহ্য ১৭ এবং ১৮ শতকে জনপ্রিয়তার বিচারে সবচেয়ে এগিয়ে ছিল। বিচারক, আইনজীবী, রাজনীতিবিদ এবং অভিজাত শ্রেণি নিজ ভূমিকা ও মর্যাদার কাতারমাফিক পরচুলা পরতেন।

পরচুলা ব্যবহার করে সে যুগে সবচেয়ে বেশি খ্যাতির শিখরে চড়েছিলেন ফরাসি রানি মেরি অঁতোয়ানেত। রুটির দাবিতে ভুখা মিছিল দেখে তিনি নাকি অবাক হয়ে বলেছিলেন, ওদের ঘরে কি বাসি কেকও নেই? আমার পরে সব বন্যায় তলিয়ে যাক–এমন স্বৈরিণী উক্তিও তার নামেই চলছে।

পরচুলা নিছক অলংকার না হয়ে রাজনৈতিক বার্তাও বহন করতে পারে–তা-ও দেখিয়েছিলেন রানি মেরি। সময়ের প্রয়োজন বুঝে পরচুলাকে খুদে জাহাজ, রণাঙ্গন বা অন্য কোনো বিষয় সাজিয়ে তুলতেন তিনি। তার পরচুলা এভাবে রাজনৈতিক বার্তা বহন করত।

অলংকরণ এবং রাজনৈতিক বার্তার সংমিশ্রণে মেরির পরচুলা ফরাসি রাজদরবারের বিলাস-ব্যসন এবং অপচয়ের বাড়াবাড়িকে প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছিল। দারিদ্র্যের কঠোর নাগপাশে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানহারা ফরাসি আমজনতা এতে মারমুখো হয়ে উঠতে থাকে। তাদের এই ক্রোধই ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম উপাদান হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত মেরি অঁতোয়ানেতের গর্দান গিলোটিনে কাটা পড়ে। গিলোটিনে যাওয়ার সময়ও তার সখের কেশদামের যেন ক্ষতি না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখতে নাকি জল্লাদকে অনুরোধ করেছিলেন।

ভিক্টোরিয়ার যুগে অর্থাৎ ১৮০০ দশকে প্রাকৃতিক চুলই জনপ্রিয়তায় ভাসতে থাকে। ফরাসি বিপ্লব চলাকালে রাজরাজাদের পরচুলা পরিহিত গিলোটিনে কাটা গর্দানের দৃশ্য তখনো জনমনে জ্বলজ্বলই করছে। এ সত্ত্বেও সে যুগের পুরুষরা ছোট ছোট পরচুলা পরতেন। ভিক্টোরীয় যুগের ইংল্যান্ডের নারীরা চুলকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে, ঘন দেখানোর জন্য 'বিড়া' ব্যবহার করতেন। কিংবা বেণীকে দক্ষ হাতে বুনে চুলকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখাতেন।

১৯৫০-এর দশকে ফের পরচুলার পালে নতুন করে জনপ্রিয়তার হাওয়া লাগে। কৃত্রিম চুল রং করার প্রযুক্তি এ সময় উদ্ভাবিত হয়। ১৯০৯ সালে ইউজেন গুলার (ল অরিয়ালের প্রতিষ্ঠাতা) চুলের কৃত্রিম রং আবিষ্কার করেন। কৃত্রিম রং এবার সৌন্দর্যশিল্পের (বিউটি ইন্ড্রাস্ট্রিজ) অঙ্গনে ঢুকে পড়ে। ১৯২০-এর দশকের হাওয়া ঘুরতে শুরু করে। নারীরা চুল ছোট করে কাটতে থাকে। একদিকে আধুনিকতা, স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্যের প্রতীকের স্থান দখলে নেয় নারীর ছোট চুল। পূর্ববর্তী প্রজন্মের লম্বা চুলের ঐতিহ্য থেকে বের হয়ে আসার জেদি চেতনা থেকে ছোট চুল রাখার স্রোতে গা ভাষায় নারীরা।

১৯২৯ সালে মার্কিন স্টক মার্কেটে ধস নামে। দেশটির অর্থনীতি মহামন্দার অন্ধকারে তলিয়ে যায়। খাদ্য এবং মাথা গোজার উপযুক্ত ঠাঁইয়ের তালাশে হন্যে মানুষজন। নাজুক এ পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই সৌন্দর্যশিল্প মারাত্মক বিপর্যয়ে পড়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মার্কিন অর্থনীতি আবার চাঙা হয়ে উঠতে থাকে। পরচুলার বাজার সরগরম হয়ে ওঠে। এবারে আবারও সাংস্কৃতিক বিভাজনের নতুন চিহ্ন হয়ে দেখা দেয় পরচুলা।

১৯৫০ দশকের গোটা সময় ধরে মার্কিন নারীদের কাছে জনপ্রিয়

রানি প্রথম এলিজাবেথ।

> পরচুলা নিছক অলংকার না হয়ে রাজনৈতিক বার্তাও বহন করতে পারে–তা-ও দেখিয়েছিলেন রানি মেরি। সময়ের প্রয়োজন বুঝে পরচুলাকে খুদে জাহাজ, রণাঙ্গন বা অন্য কোনো বিষয় সাজিয়ে তুলতেন তিনি। তার পরচুলা এভাবে রাজনৈতিক বার্তা বহন করত।

অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে পরচুলা। ১৯৬০-এর দশকে বর্ণবাদী উত্তেজনা টগবগে হয়ে ওঠে। শ্বেত নারীরা এবারে পরচুলার পাট চুকিয়ে দিল। পরচুলা মোটেও লাটে উঠল না। বরং আফ্রিকান-আমেরিকান নারীরা মাথায় তুলে নিলো পরচুলাকে। সাথে সাথেই সৌন্দর্য ব্যবসা নতুন এক মোড় পরিবর্তনের কাণ্ড দেখতে পেল।

পরচুলা ব্যবহারের সাংস্কৃতিক এই বিভাজন রেখা দশকের পর দশক ধরেই টিকে থাকে। ২০০০ দশকের সুপ্রভাত থেকে পরচুলা ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের বাতাস আবার বইতে থাকে। ক্যান্সার বা কর্কট রোগে চুল খোয়ানো মানুষের কাছে ফ্যাশন হিসেবে পরচুলা ব্যবহার হতো। অন্তত শ্বেত মানুষদের ফ্যাশনশিল্পের বেলায় এ প্রবণতা দেখা গেছে। ২০০০ দশকের গোড়া দিক থেকে নামজাদা বা সেলিব্রেটি শ্বেত ব্যক্তিত্বরা পরচুলা ব্যবহারের কথা খোলামেলাভাবেই বলতে শুরু করেন। পরচুলা নিয়ে ভাবনাচিন্তার আবারও মোড় পরিবর্তন ঘটে। বিশেষ করে আফ্রিকান আমেরিকান নামজাদা ব্যক্তিদের অনেকেই নিজেদের ভাবমূর্তির অংশ হিসেবে প্রকাশ্যেই পরচুলা পরতে থাকেন।

পরচুলায় দিয়ে স্বাভাবিক চুল পুরোটাই ঢেকে ফেলা হয়। ২০০৯ সালের দিকে সাশ্রয়ী মূল্যের হেয়ার এক্সটেনশন জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকল। লম্বা ও সুন্দর চুলের জন্য পরচুলার বদলে এই হেয়ার এক্সটেনশনের দিকে মানুষ ঝুঁকতে থাকল। তারপরও পরচুলা আসর থেকে বিদায় হলো না। বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের অনেকেই এখনো পরচুলাই ব্যবহার করেন। এ নিয়ে গর্বও করেন।

২০১০ শতকে এসে বিজ্ঞানকল্প, ফ্যান্টাসি, ভিডিও গেম এবং অন্যান্য বিশেষ আগ্রহ বা শখকে উপজীব্য করে গড়ে ওঠা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন গ্রিক কালচারের সূচনা হলো। এ যেন ব্রাত্য জনের সখা! নারদ এবং অপ্রচলিত হিসেবে পরিচিত ফ্যাশনও জোরালো হয়ে উঠল। নিজের পছন্দের কাল্পনিক চরিত্রের অনুকরণে রংবেরংয়ের পরচুলা বা মেকআপ ব্যবহার চলতে থাকল। সৌন্দর্যশিল্প এসব ক্ষেত্রে মোটা বিনিয়োগ করতে থাকল। রং মাখলেই তাকে সৎ হিসেবে গণ্য করার দিন আর থাকল না। সহজভাবেই নেওয়া হতে থাকল এমন সব মানুষকে।

সৌন্দর্যশিল্পের ভাঙাগড়া এবং বিবর্তন চলছে। চলছে পরিবর্তন। তারপরও সৌন্দর্যশিল্প হয়ে উঠছে চিরন্তনের বিষয়। এর আগে প্রকাশিত এক হিসাবে বলা হয়েছে, ২০১৮ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে বিশ্বে পরচুলা এবং হেয়ার-এক্সটেনশনের বাজার গড়ে ৮ শতাংশ বাড়বে।

বিপণন এবং উদ্ভাবকদের মতো সৌন্দর্যশিল্পের পেশাদার মানুষগুলোকে নতুন নতুন প্রবণতার স্রোতের সাথে তাল মেলাতে হয়। সেই প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত পরচুলাকে অনেক উত্থান-পতনের বন্ধুর অলিগলি সড়ক-মহাসড়ক পাড়ি দিতে হয়েছে। কিন্তু তারপরও আগামী অনেক দশক ধরেই পরচুলার পাল জনপ্রিয়তার বাতাসে ফুলে ফুলে উঠবে। এমন ধারণাই করছেন অনেকে।

চুলে লেখা জীবনকাহিনির শেষ অধ্যায়

আমিল বতুল

মৃত মানুষের চুল থেকে যা জানতে পারছেন নৃবিজ্ঞানীরা।

দ্য আটলান্টিকে এ বিষয় নিয়ে একটি লেখা লিখে ছিলেন ম্যাক্স জি লেভি এবং স্যাপিয়েন্স। সেখানে এক শিশু কন্যা যার নাম এডিথ হাওয়ার্ড কুক। তার জীবনের কথা লেখা ছিল লালচে সোনালি চুলে। তার চুলের এক অংশ থেকে জানা যায়, সান ফ্রান্সিসকোতে গ্রীষ্মকালটি ছিল বর্ষণমুখর। অন্যদিকে চুলের আরেকটি অংশ বলছে শীতকাল ছিল শুষ্ক। ১৮৭৬ সালে এডিথ মাত্র দুই বছর বয়সে মারা যায়। সব মিলিয়ে সে বছরের ঋতু কেমন গেছে, তাই লেখা হয়ে গেছে এডিথের লালচে সোনালি বরন কেশে।

২০১৬ সালে একজন নির্মাণশ্রমিক একটি বাসভবনের উঠান থেকে এডিথের খুদে কফিনটি উদ্ধার করে। শিশু কন্যার পরিচয় উদ্ধারে সহায়তা করেছেন নৃবিজ্ঞানী জেলমার ইয়ারকেন্স। ডেভিসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নবিদ ইয়ারকেন্স এই শিশুকন্যাকে শনাক্ত করতে সহায়তা করেছেন। নিজেরই বাচ্চা-কাচ্চা আছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ১৮০০ দশকের মানুষের জীবনযাপনের হাল-হকিকতের দশা কী ছিল, তা নিয়ে মাথা ঘামাই। সে যুগে শিশুমৃত্যু খুবই স্বাভাবিক ছিল।

১৯০০ সালের হিসাবে উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরা যায়। সে বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যারা মারা গিয়েছিল, তাদের ৩০ জন ছিল অনূর্ধ্ব ৫ বছরের। বেশির ভাগ সময়ই শিশুরা মারা যেত যক্ষা এবং ফ্লুতে ভুগে। ঋতুভেদে এসব রোগব্যাধির প্রকোপ কমবেশি হতো। তিনি বলেন, সে সময় বাচ্চার অসুখ হলে প্রশ্ন উঠত, ও কি বাঁচবে না মারা যাবে?

আমেরিকান জার্নাল অব ফিজিক্যাল অ্যানথ্রোপলজিতে নতুন এক সমীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। ইয়ারকেন্স এবং তার সহকর্মীরা নতুন এক পদ্ধতি বের করেছেন। এ পদ্ধতিতে মৃত ব্যক্তির চুল বিশ্লেষণ করে মৃত্যুকালের ঋতু সম্পর্কে তথ্য বের করা যাবে। চুলে হাইড্রোজেন আইসোটোপসের মতো রাসায়নিক চিহ্ন পরীক্ষা করে ঋতুভিত্তিক পানির ধরন বোঝা যায়। তাদের এ পদ্ধতি অতীতে ঋতু পরিবর্তনের প্রভাবে মৃত্যুর কারণ বের করতে কাজে লাগতে পারে।

নথিপত্র বলছে, ঋতু পরিস্থিতির সাথে সাথেই ঐতিহাসিকভাবে মৃত্যুহারের ওঠানামা হয়েছে। মানুষের ইতিহাসের পরিষ্কার চিত্র পেতে যেকোনো বয়সের মানুষ, তার ভৌগলিক অবস্থান এবং যুগের ঋতুর চিত্র সে সময়ের নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলবে। মানুষের ইতিহাসকে নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করাকেই নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস বলা হয়ে থাকে। এ ধারাবাহিকতায় নথিভুক্ত তথ্যের বাইরের নানা সূত্র ঘেঁটে অতীত মানুষের অভিজ্ঞতা উদ্‌ঘাটন করে। আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃশ্যপট তুলে আনার কসরত করে। এভাবেই প্রাচীন মহামারি বা ভুলে যাওয়া ঋতুভিত্তিক সংঘাতের কাহিনিও তুলে আনা যেতে পারে।

ইয়ারকেন্স মনে করেন, মৃত্যুকে কেন্দ্র করে প্রচলিত সামাজিকতা এবং আচার বা রীতিনীতি মানুষকে শোক বলয়ের বাইরে আসতে সহায়তা করে। বছরের সুনির্দিষ্ট সময়ে বহু

ইয়ারকেন্সের দল এবারে গোটা বছর ধরে সান ফ্রান্সিসকোর পানিতে আইসোটোপের পরিবর্তন কীভাবে ঘটছে, তার বিবরণ বের করে। চুলের আইসোটোপ নির্দিষ্ট অঞ্চল এবং ঋতুর বার্ষিক গতিপ্রকৃতিকে তুলে ধরে।

কোনো পদার্থের প্রোটন সংখ্যা সমান কিন্তু নিউট্রন সংখ্যা সমান না হওয়ায় ভর কম বা বেশি হলে তাকে আইসোটোপ বলে। হাড় বা চুলের নমুনায় আইসোটোপ বের করার জন্য ম্যাস স্পেকট্রোমিটারস ব্যবহার করা হয়।

মৃত্যুর ঘটনা ঘটলে তার প্রভাব বর্তায় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং ইতিহাসের ওপর। ঋতুভিত্তিক মৃত্যুর এ ধারা নিয়ে গবেষণার একটি প্রক্রিয়া হতে পারে ইয়ারকেন্সের পদ্ধতি।

তাই প্রত্নবিদ্যায় আইসোটোপের কার্যকর উৎস হতে পারে চুল। হাড় বা দাঁতেও আইসোটোপ থাকে। কিন্তু ২০ বছরের পর হাড় বা দাঁতে বাড়ে না। এই কাণ্ড চুলে ঘটে না। জীবন ভর চুল গজায়।

কোনো পদার্থের প্রোটন সংখ্যা সমান কিন্তু নিউট্রন সংখ্যা সমান না হওয়ায় ভর কম বা বেশি হলে তাকে আইসোটোপ বলে। হাড় বা চুলের নমুনায় আইসোটোপ বের করার জন্য ম্যাস স্পেকট্রোমিটারস ব্যবহার করা হয়। মানুষের দেহাবশেষের আইসোটোপ পরীক্ষা করে প্রত্নবিদেরা মৃত ব্যক্তির সাথে তার পরিবেশের সম্পর্ক বের করার চেষ্টা করেন। পরিবেশের সাথে তার লেনদেন কেমন ছিল, তা বের করার তৎপরতা চালানো হয় এভাবেই।

প্রত্নতত্ত্বে চুলের গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবেশ থেকে কার্বন, নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের তথ্য ধরে রাখে চুল। ইয়ারকেন্স বলেন, দ্রুত বৃদ্ধি পায় বলে অসাধারণ হয়ে উঠেছে চুল। চুল সঠিকভাবে পরীক্ষা করে মৃত এক মানুষের জীবন ও আচরণ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যেতে পারে। তবে প্রত্নবিদদের কাছে এত কাজের এ চুল নিয়েও সমস্যা আছে। অনেক কবরের পরিবেশে হাড় দীর্ঘ সময় টিকে থাকলেও চুল টিকে থাকে না। নিউজল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব ওটাগোর জীবাশ্মবিদ সিয়ান হ্যালক্রো বলেন, উপযুক্ত পরিবেশে সংরক্ষিত চুল পাওয়ার ঘটনা প্রায়ই বিরল।

এডিথের কথায় ফিরে আসি, তাকে সমাহিত করা হয়েছিল বায়ুরোধী ধাতব কফিনে। ১৪০ বছরের বেশি সময় মাটির তলায় থাকার পরও এ কারণে শিশু কন্যাটির দেহ পচেগলে যায়নি। ২০১৬ সালে নির্মাণকর্মীরা এডিথের কফিনটি উদ্ধার করে। কেনেথের চুলের দুটি গোছা নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় আইসোটোপ বিশ্লেষণ বিশেষজ্ঞ ইয়ারকেন্সকে।

এক বছর পরে ইয়ারকেন্স এবং তার সহকর্মীরা এডিথের চুলের কার্বন এবং আইসোটোপ বিশ্লেষণ করেন। তারা দেখতে পান দীর্ঘ অসুস্থায় ভুগে ধীরে ধীরে পুষ্টিহীন হয়ে মারা গেছে এডিথ। এতে এডিথকে শনাক্ত করার কাজও এগিয়ে যায়। এ বিশ্লেষণের পরও কিছু চুল ইয়ারকেন্সের কাছে মজুত ছিল। এবারে হাইড্রোজেন আইসোটোপ বিশ্লেষণের কাজে লাগান এই চুল। ইয়ারকেন্স জানতেন যে এডিথ ১৩ অক্টোবর ১৮৭৬ সালে সান ফ্রান্সিসকোতে মারা গিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই তিনি ধরে নেন, সে সময়ের তথ্যেই ধারণ করেছে এডিথের চুল।

ইয়ারকেন্সের দল এবারে গোটা বছর ধরে সান ফ্রান্সিসকোর পানিতে আইসোটোপের পরিবর্তন কীভাবে ঘটছে, তার বিবরণ বের করে। চুলের আইসোটোপ নির্দিষ্ট অঞ্চল এবং ঋতুর বার্ষিক গতিপ্রকৃতিকে তুলে ধরে।

ইয়ারকেন্সের দল এডিথের চুলের ৫০টি গোছা বিশ্লেষণ করেছিল। চুলের কেরাটিনে থাকা হাইড্রোজেন আইসোটোপের মাত্রার সাথে সান ফ্রান্সিসকোর ঋতুচক্রকে মিলিয়ে দেখে। ফলে মৌসুমভিত্তিক প্রভাব চুলে দেখতে পায় তারা। এর ভিত্তিতেই নিশ্চিত হওয়া যায় যে এডিথের জীবনের শেষ ঋতু ছিল শরৎকাল।

পরিবেশসংক্রান্ত আদল বা মডেলের সাথে সাথে এডিথের চুলের বিশ্লেষণ করা হয়। এর ভিত্তিতে ইয়ারকেন্স সিদ্ধান্ত নেন যে শিশু এডিথ সান ফ্রান্সিসকোর বে এলাকায় বসবাস করত। পাতা ঝরার মৌসুম শরতে তার মৃত্যু ঘটেছে। হ্যালক্রো বলেন, এই সমীক্ষাকে বিস্ময়কর এবং বড় মাপের বিজ্ঞান-সমীক্ষা বলতেই হবে।

আবারডিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নবিদ কেন ব্রিটন এ গবেষণাকে অনবদ্য সমীক্ষা হিসেবে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি হ্যালক্রো এবং তিনি সতর্কতাও উচ্চারণ করেন। বলেন, সুসংরক্ষিত চুলের ওপরই এ গবেষণা একান্তভাবে নির্ভর করছে। উষ্ণ এবং স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশে চুল দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়, উল্লেখ করেন তিনি।

এরপরও কোনো কোনো জলাধার, বরফাবৃত প্রান্তর, শুকনো বা নোনা পরিবেশেও চুল সংরক্ষিত থাকতে পারে। ব্রিটন এবং হ্যালক্রো মনে করেন, মমিতে রূপান্তরিত দেহাবশেষ উদ্ধার করে ইয়ারকেন্সের পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিশ্বব্যাপী ভুলে যাওয়া বিশ্বমারির স্বরূপ উন্মোচন করা যেতে পারে।

উত্তর চিলির শুষ্ক পরিবেশে প্রাকৃতিকভাবে সংরক্ষিত দেহাবশেষ বিশ্লেষণ করছেন হ্যালক্রো। ইয়াকেনন্সের পদ্ধতি তার কাজেও ব্যবহার করা যাবে বলেই মনে করেন হ্যালক্রো। চিলির চিনচোরা সংস্কৃতিতে মানুষের উচ্চ মৃত্যুহার নিয়ে নানা তত্ত্ব রয়েছে। খ্রিষ্টপূর্ব ৭০০০ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ পর্যন্ত বসবাস করত এই মানবগোষ্ঠী। অঞ্চলটিতে স্ক্যার্ভি রোগের কিছু কিছু আলামত পাওয়া গেছে। তাতে মনে করা হয়, আল নিনো প্রভাবিত খরা এবং এই খরা থেকে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ হয়তো মৃত্যু ডেকে এনেছে। সুরক্ষিত দেহাবশেষ থেকে জোগাড় করা চুল হয়তো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যেতে পারে। হয়তো এ থেকে জলবায়ু এবং মৃত্যুর সাথে সম্পর্কের বিষয়টি প্রমাণিত হবে। হ্যালক্রো বলেন, আরেক ধরনের আইসোটোপ বিশ্লেষণ ব্যবহার করা হলে তা সত্যিই বেশ উল্লেখযোগ্য হবে।

চুলের আইসোটোপ বিশ্লেষণ করার সাথে যেন উদ্ভিদ চক্র বা প্রাচীন শিলাস্তর পাঠ করার মতো হচ্ছে। ইয়ারকেন্স বলেন, চুলের কয়েকটি গোছাও মৃত মানুষের সময়কাল সম্পর্কে গুরুত্বের অনেক তথ্য প্রকাশ করতে পারে। চুলকে বৃদ্ধির খুদে খুদে স্তর হিসেবে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে এক বা দুই সপ্তাহের বিশদ তথ্য এখানে লুকিয়ে রয়েছে।

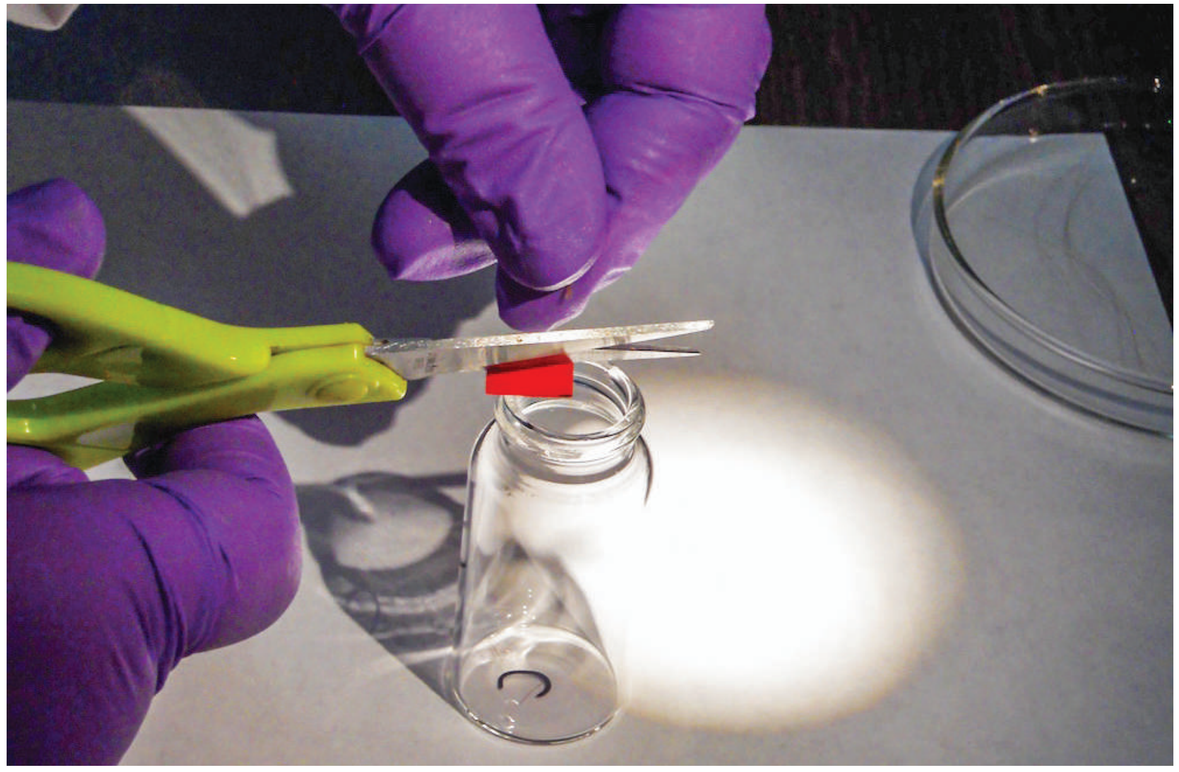

তরাস

২ পৃষ্ঠার পর

‘জম্বিরা তোকে ধিঙ্গি মহিলা বলে? তারা কি তোর বন্ধু?’

‘আম্মা-আ-আ-আ-আ!’

কেউ বললে সাকিনার মেয়ে ও লেভেল দিয়ে বসে আছে?

ভাই-বোনের সম্পর্ক হলো এই পৃথিবীর সেরা সম্পর্ক।

বইন নাই যার

পোড়াকপাল তার

কী বলিব আর

জগৎ অন্ধকার

পল্লিকবি রশিদউদ্দিনের কবিতা। নেত্রকোনার বারহাট্টায় গিয়ে এই কবির সাক্ষাৎ পেয়েছিল নজরুল। আট বোনের এক ভাই কবি। বোনেরা সিদ্ধান্ত করে দিয়েছেন জগৎ সংসারের খড়খুটো কি খুদকুঁড়োর কথা ভাবতে হবে না ভাইকে। ভাই কবি, কবিতা লিখবে। নজরুলের সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হয়, দুই পত্নী বর্তমান কবির। তাদের কোলেকাঁখে তিন দুই পাঁচ সন্তান। এর মধ্যে রিকা গ্রামের এক কইন্যাকে দেখে কবির মন উচাটন হয়েছে। একে ছাড়া বাঁচবেন মনে করেন না। বোনেরা এটা মানেন কীভাবে? রিকা গ্রামে গিয়ে সেই কইন্যার বাবা-চাচা-মা-ফুফু-চাচির সঙ্গে কথা বলে বন্দোবস্ত করেছেন।

কবি রশিদউদ্দিনের কিছু পোর্ট্রেট করেছিল নজরুল। পেন অ্যান্ড ইংকে। স্কেচ খাতায় আছে। স্কেচ খাতা ০২৩৭। আরও কয়েকজনের পোর্ট্রেট আছে খাতায়। কিছু পোর্ট্রেট আছে তরাসের। গাছতলা গ্রামের তরাস। শুধু নাম শুনে সেই গ্রামে চলে গিয়েছিল নজরুল। একটা গ্রামের নাম গাছতলা! হাবিবের দেশের বাড়ি গাছতলায়। নজরুলের বন্ধু স্কাল্পচারের হাবিব। শীতকালে গাছতলায় গিয়েছিল তারা। ছায়া সুনিবিড় সেই গ্রাম। নিস্তরঙ্গ প্রায়। বিরাট এক অচিন বৃক্ষ আছে শ্মশানে। দুপুরে হাবিবের সঙ্গে সেই বৃক্ষ দেখতে গিয়েছিল নজরুল। কালো শুকনা এক কিশোরীকে দেখল বসে আছে অচিন বৃক্ষের ঝুরিতে। বটগাছের মতো ঝুরিঅলা বৃক্ষ। শালগাছের পাতার মতো পাতা। ছোট ছোট সাদা ফুল ফোটে। শীতকালের সেই নিরালা দুপুর আর কেউ ছিল না শ্মশানে। ছমছমে ভাব ছিল হয়তো। হাবিব মেয়েটাকে দেখে বিস্মিত হলো না। সহজ গলায় বলল, ‘কী রে তরাস?’

মেয়েটা হাসল।

হাবিব বলল, ‘শীত লাগে না রে তোর?’

তরাস সেই হাসল, ‘না গো হুরু ভাই। শীত লাগে না, গরম লাগে না। বোধ পাই না।’

হুরু ভাই মানে ছোট ভাই। হাবিবকে হুরু ভাই ডাকে তার ভাই-বোনেরা। এই মেয়ে কে? কালো শুকনা তবে শাণিত পোর্ট্রেট। মন নিশপিশ করে উঠল নজরুলের। হাবিব বলল, ‘ড্রয়িং করবি?’

‘ক্লাসিক্যাল পোর্ট্রেট।’

‘হুমম। দেখি।...ও তরাস, চা খাবি রে?’

‘না গো হুরু ভাই, চা খাই না। চা আমি খাই না পুড়া সালুন চাই না, চা আমি খাই না পুড়া সালুন চাই না, চা আমি খাই না পুড়া সালুন চাই না–।’

‘চুপ কর তরাস।’

চুপ করল।

‘চুপ করে থাক। নড়িস না কেমন?’

‘তোমরা আমার ফটো তুলবা গো হুরু ভাই?’

‘হ্যাঁ ফটো তুলব। তুই বসে থাক।’ হাবিব বলল। নজরুল স্কেচ খাতা নিয়ে ঘাসে বসে পড়ল। মার্কার পেনে তিনটা পোর্ট্রেট করল তরাসের। বলপয়েন্ট কলম দিয়ে একটা করল–এটা ডিটেইল। তরাস তার ‘ফটো’ দেখল না। হঠাৎ উঠে হাঁটা দিল। হাবিব ডাকল, তোর ফটো দেখে যা–শুনল না। হেঁটে যেতে যেতে নাই হয়ে গেল। নজরুলের মনে হলো যেতে যেতে একটা গাছ হয়ে গেল মেয়েটা। এত গাছের মধ্যে কোনো একটা গাছ। –মেয়েটার নাম তরাস। তরাস কেন? তরাস কি? ত্রাস থেকে তরাস?

ত্রাস থেকে তরাস। হাবিব বলল। ভাটি অঞ্চলের গরিব মানুষদের নাম এমন ধারা হয়। তরাসের বাপের নাম হরিধন কৈবর্ত। মায়ের নাম উলুপী দাসী। ভাইয়ের নাম ছিল শাটুল কৈবর্ত। শাটুল মাটির পাখি বানাতে পারত। রোদে শুকিয়ে সেইসব পাখি রং করত। সারা জীবনে এক শ আটটা পাখি বানিয়ে দিয়েছিল বোন তরাসকে। সেই এক শ আটটা পাখি এখনো হরিধন কৈবর্তর ঘরে আছে। নজরুল গাছতলার

> আমি তাকে চিতায় পুড়ে যেতে দেখেছি। বৃষ্টি বাদলার ভেজা দিন ছিল, চিতার কাঠ ভিজে নিভে যাচ্ছিল, তবুও পুড়ে গিয়েছিল সে।

কৈবর্তপাড়ায় গিয়ে দেখেছে। হরিধন কৈবর্ত ঘরে ছিল না। উলুপী দাসী লম্বা ঘোমটা টেনে কলা বউ হয়ে বসেছিল ঘরের বারান্দায়। হাবিব আর নজরুল ঘরে ঢুকে মাটির পাখির হাট দেখেছে।

লঞ্চডুবি হয়ে মরেছিল শাটুল। বাপের সঙ্গে টাউনের হাটে গিয়েছিল। হরিধন কৈবর্তর কিছু হয় নাই। আঠারজন নারী-পুরুষ-শিশুর প্রাণহানি হয়েছিল। ডুবুরি নেমেছিল, ডুবুরিদের সঙ্গে এলাকার লোকজন। শাটুলের লাশ তারা কেউ পায় নাই। ধর্মীয় যেসব আচার করতে হয়, সাধ্যমতো করেছিল হরিধন কৈবর্ত। শাটুল তার বোনকে ছেড়ে যায় নাই। বোন কী করে থাকে ভাইকে ছেড়ে? শাটুলের সঙ্গে একদিন চলে গেছে তরাস। করাতিপাড়ার মনোধীর করাতি দেখেছে। মনোধীর করাতি নেশা ভাং করে না। সাদাচোখে শাটুল তরাসকে হিজল বনে ঢুকে যেতে দেখেছে।

তরাসের লাশ বানের পানিতে আটকে ছিল অচিন বৃক্ষের ঝুরিতে। হরিধন কৈবর্ত সৎকার করেছে। আট-নয় বছর আগের ঘটনা। তরাসকে হেথায় সেথায় এখনো দেখা যায়। বিশ্বাসযোগ্য গল্প?

‘সত্যি মরে গিয়েছিল সে? হাবিব?’

‘আমি তাকে চিতায় পুড়ে যেতে দেখেছি। বৃষ্টি বাদলার ভেজা দিন ছিল, চিতার কাঠ ভিজে নিভে যাচ্ছিল, তবুও পুড়ে গিয়েছিল সে।’

হাবিব এখন থাকে আমেরিকায়। আর্ট গ্যালারির অ্যাসিস্ট্যান্ট কিউরেটর। ফেসবুকে, এক্স হ্যান্ডেলে সরব। যোগাযোগ আছে নজরুলের সঙ্গে। ফেসবুকে গ্রুপ আছে তাদের। নিয়মিত ভিডিও কনফারেন্স করে। দুই বছর আগে তাকে একবার তরাসের কথা জিজ্ঞাস করেছিল নজরুল। হাবিব তৎক্ষণাৎ সদুত্তর দিতে পারে নাই। দেশের বাড়িতে এখন কেউ নাই হাবিবের। পরে অনুসন্ধান করে বলেছে গাছতলার কেউ আর তরাসকে দেখে না। গাছতলা সেই গাছতলা নাই আর। মার্কেট হয়েছে শ্মশানের একাংশে। অচিন বৃক্ষ কেটে ফেলা হয়েছে–ঝুরি কোটরে সাপের অবাধ কলোনি গড়ে উঠেছিল। কোনো সাপ যদিও কোনো দিন কোনো মানুষকে কামড়ে দেয় নাই। যে মেয়েটার নাম ছিল তরাস, দেখেছিল সে মৃত ছিল যে, তার জন্য এই শীতের রাতে বড় মন কেমন হলো নজরুলের। রাত এখন একটা। রাজনীতিক দীনেশ তকিউল্লাহর পোর্ট্রেটটা শেষ হয়েছে মাত্র। এক মগ কফি বানাল নজরুল। সিগারেট ধরাল। র‍্যাক থেকে স্কেচখাতা ০২৩৭ নিল। বিগত ছয়-সাত বছরের মধ্যে এই খাতা আর খুলে দেখে নাই। ধুলা জমেছে মলাটে, কিনারে। ঝেড়ে মুছে খুলল। কবি রশিদউদ্দিন মারা গেছেন, তার পোর্ট্রেটগুলো দেখল। তরাসের পোর্ট্রেট দেখল। এটা কী আরে! মার্কারের ড্রয়িং, বল পয়েন্ট কলমের ড্রয়িং–পোর্ট্রেট ঠিক আছে তরাসের। কিন্তু এগুলো কার পোর্ট্রেট? তরাসের পাশে? ডাগরচোখ কালো এক বাচ্চা ছেলের পোর্ট্রেট। চোখের ড্রয়িং-এ মিল আছে তরাসের সঙ্গে। এর পোর্ট্রেট এখানে কে আঁকল? নজরুল আঁকে নাই। কোনো দিনই আঁকে নাই। তবে? ছবি তুলে সেন্ড করল হাবিবকে। অনলাইনে আছে হাবিব। কল দিয়ে বলল, ‘এ তো শাটুল।’

‘কী?’

‘শাটুল। শাটুল। তরাসের ভাই। তুই তার পোর্ট্রেট কী করে আঁকলি।’

‘আঁকি নাই।’

‘কী?’

‘হ্যাঁ। ইয়ে।’

‘হ্যাঁ ইয়ে মানে? তুই শাটুলকে দেখিস নাই নজু।’

দেখেও নাই, আঁকেও নাই। তবে তার স্কেচখাতায় শাটুলের পোর্ট্রেট কে এঁকে রাখল?

ভাই বলল ডরাস

বোনের নাম তরাস।

ছোট আরেকটা ঘটনা ঘটল। তন্বী শ্যামা শিখর দশনা শশী। গতকাল আলাপ পরিচয় হয়েছে। সে বলেছে সে ফেসবুকে আছে। ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাবে নজরুলকে। পাঠিয়েছে। নজরুল ফেসবুকে লগ ইন করল। ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে শশী। এক্সপেক্ট করে শশীর আইডি দেখল নজরুল। শশীর সম্পূর্ণ নাম দেখল–শশী টোরাস রোজারিও। ●

২৯.১২.২৪

হেয়ার ডাই

১৬ পৃষ্ঠার পর

হেয়ার ডাই প্রযুক্তির পরিসর। যুক্তরাজ্যের লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ডেভিড লুইস মনে করেন, এটি একটি ‘ক্রেজি’ ব্যাপার। ‘এখন আমি টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির ডাই এবং ডাই উপাদান সম্পর্কে বহু কিছু জানি। আমরা কখনো এসব টেক্সটাইলে ব্যবহারের স্বপ্ন দেখিনি’, তিনি বলেন। ‘প্রাচীন, প্রত্নতাত্ত্বিক এইসব জিনিস মনে আসে। কেন তারা এসব মানুষের মাথায় লাগিয়ে রাখে।’

গবেষণা অধ্যাপক লুইস জানান, সুন্দর বাদামি বেণী তৈরির পথে রঙের অণুগুলো ইলেকট্রন স্কেভাঞ্জারে পরিণত হয়। ইলেকট্রনের এই প্রয়োজন অন্য অণু মেটাতে পারে না, তাই ইলেকট্রন স্কেভাঞ্জারও আক্রমণাত্মক আচরণ করে, অ্যালার্জি সৃষ্টি করে এবং ডিএনএর ক্ষতি করে।

লুইস এই কারণে আরও চিন্তিত যে ভোক্তার নিরাপত্তার ওপর বিউটি ইন্ডাস্ট্রির বেশ শক্তিশালী প্রভাব রয়েছে। ১৯০৬ সালে মার্কিন খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসনের আধুনিক যুগ শুরু হয়। তখন এটি ব্যুরো অব কেমেস্ট্রি নামে পরিচিত। ১৯৩০ সালে ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যামেন্ডমেন্ট্রেশন নাম নেয় সংস্থাটি। এফডিএ তখন থেকে বিভিন্ন ধরনের ডাই নিষিদ্ধ করে আসছে। তবে চুল রং করার জন্য সব সময়ই কয়লা ও আলকাতরার ডাইকে নিরাপদ বলে আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে আসছে তারা। তুকে জ্বালাপোড়া না হলে ব্যবহার করা যাবে বলে তাদের মন্তব্য।

১৯৭৯ সালে এফডিএ জোর দেয়, হেয়ার ডাই নির্মাতারা তাদের পণ্যের গায়ে এই কথাটি লাগিয়ে দেবেন: ‘সতর্কতা: এখানে এমন উপাদান রয়েছে, যা আপনার শরীরে প্রবেশ করতে সক্ষম এবং গবেষণাগারে পরীক্ষায় দেখা গেছে এসব উপাদান প্রাণীদের মাঝে ক্যান্সার সৃষ্টি করতে সক্ষম।’ সেই উপাদানগুলো হলো ৪-এমএমপিডি, ৪-মেথক্সি-এম-ফেনালাইলেনডিয়ামাইন। শেষেরটি এমন একটি ডাই, যার সঙ্গে পিপিডির বেশ কাঠামোগত মিল রয়েছে। কিন্তু এফডিএ এটিকে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রমাণ-সূত্র দিয়ে দেখিয়েছে এটি কার্সিনোজেনিক। হেয়ার ডাই নির্মাতারা এফডিএর সিদ্ধান্ত মানতে অস্বীকৃতি জানায়, উল্টো মামলার হুমকি দেয়। চাপের মুখে এফডিএ তার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে। কয়েক বছর পর নির্মাতারা কার্সিনোজেনিক যৌগটি সরিয়ে ফেলে। ৪-এমএমপিডি বহাল রাখে।

হেয়ার ডাইয়ের সম্ভাব্য ঝুঁকি নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা হয়েছে। ২০০১ সালে সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার গবেষকেরা একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন ‘ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ক্যান্সার’-এ। এর উপসংহারে বলা হয়, যারা ঘন ঘন হেয়ার ডাই করে, তাদের মূত্রাশয় ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি সাধারণের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। ‘ইউরোপিয়ান কমিশন অন কনজ্যুমার সেফটি’ এটি গুরুত্ব দিয়ে আমলে নিয়েছে। বিজ্ঞানীদের একটি দল গবেষণাটিকে মূল্যায়ন করেছে এবং এটিকে বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্বাসযোগ্য বলে মতামত দিয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের হেয়ার ডাই রেগুলেশন পূনর্মূল্যায়নের সুপারিশও করেছে তারা।

গত এক দশকে ইউরোপীয় কমিশনের নির্দেশনায় সাইন্স কমিটি অন কনজ্যুমার প্রোডাক্ট (এসসিসিপি) হেয়ার ডাই পণ্যের নিরাপত্তা মূল্যায়ন এবং এর নির্মাতাদের নামধাম সংগ্রহ করেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এ ব্যাপারে দুটি সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়েছে। প্রথমটি হলো, ডাই কেমিক্যালের সংবেদনশীলতা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সাতাশটি হেয়ার কালার উপাদানকে তারা সংবেদনশীল বলে চিহ্নিত করেছে। এর মাঝে দশটিকে ‘এক্সট্রিম’ এবং তেরোটিকে ‘স্ট্রং’ হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে। এগুলো অ্যালার্জিসহ নানা রকম ব্যাধির সৃষ্টি করতে পারে।

দ্বিতীয়টি হলো, মানুষের শরীরে প্রবেশ করে ডাই কেমিক্যাল কী করে এই সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্যের ঘাটতি। ২০০৬ সালে তৎকালীন ইউরোপীয় কমিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘নিরাপদ বলে যেসব পদার্থের কোনো প্রমাণ নেই, সেগুলো বাজার থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে। আমাদের উচ্চ নিরাপত্তা মান শুধু ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভোক্তাদের নিরাপত্তা দেয় এমন নয়; তা ইউরোপীয় প্রসাধনশিল্পের আইনি নিশ্চয়তাও দেয়।’ তারা এখন পর্যন্ত ২২টি হেয়ার ডাই রাসায়নিক নিষিদ্ধ করেছে। প্রতিবছরই নিষিদ্ধের তালিকা হালনাগাদ করা হয়।

১৯৭০ সালে নৃবিজ্ঞানী জাস্টিন কর্ডওয়েল ‘দ্য ভেরি হিউম্যান আর্টস অব ট্রান্সফরমেশন’ শিরোনামে একটি গবেষণাপত্র লেখেন। সেখানে তিনি লেখেন, ‘পোশাক এবং অলংকরণের নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এই ধারণার ভিত্তিতে হওয়া উচিত যে মানুষ আদিকাল থেকে মানবদেহকে ভাস্কর্যের প্রাথমিক রূপ হিসেবে বিবেচনা করে এসেছে। নিজের শরীরকে যেভাবে মানুষ দেখেছে, তাতে বিশেষ সন্তুষ্ট হতে পারেনি।’

প্রকৃতপক্ষে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বলে, মানুষ প্যালিওলিথিক যুগে (প্রাচীন প্রস্তর যুগে) ডাইয়ের ব্যবহার করেছে। প্রারম্ভিক মানুষেরা তাদের দেহ, বাসস্থান এবং টেক্সটাইল লাল রঙে সাজাতে ময়লায় থাকা আয়রন অক্সাইড ব্যবহার করত। ডাই করার জন্য মাথা পর্যন্ত পৌঁছাতে তাদের খুব বেশি সময় লাগেনি।

প্রাচীন মিসরীয়রা মাথা ডাই করত। তবে ডাই করার আগে চুল ফেলে দিত। তারপর রোদ থেকে বাঁচার জন্য খালি মাথায় রং করত। খ্রিষ্টপূর্ব বারো শতকের কাছাকাছি পর্যন্ত কালো ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয় রং। তখন পরচুলা লাল, নীল বা সবুজ করার জন্য বনজ উপাদান ব্যবহার করা হতো। হলুদ রং করতে ব্যবহার করা হতো স্বর্ণের গুঁড়া।

ন্যাচারাল ডাই হিসেবে বেশি ব্যবহার করা হতো মেহেদি। প্রাচীনকালে মানুষ এ ছাড়াও জাফরান, নীল এবং আলফাআলফা ব্যবহার করত। এসব প্রাকৃতিক রং সাময়িক সময়ের জন্য চুলকে রঙিন করত। এ কারণে বিকল্প কেমিক্যাল ডাইয়ের প্রতি মানুষের চাহিদা ছিল। চুলের নমুনা বিশ্লেষণ করে জানা গেছে, হাজার বছর আগে গ্রিক ও রোমানরা চুলে স্থায়ী কালো রং ব্যবহার করত। এখন যাকে আমরা লিড অক্সাইড বলে জানি তা এবং ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড মিশিয়ে লিড সালফাইড ন্যানোপার্টিকেল তৈরি করত। এটি তখন তৈরি হয়, যখন কেমিক্যাল সালফারের সঙ্গে মিশে চুলের প্রোটিন কেরাটিনে সংযোগ তৈরি করে। সিসার সরাসরি প্রয়োগ অত্যন্ত বিষাক্ত প্রমাণিত হওয়ার পর রোমানরা তাদের ব্ল্যাক ডাইয়ের ফর্মুলাটিকে দুই মাস জোঁকের গাঁজনে পরিবর্তন করে।

রোমান সাম্রাজ্যের শুরুর দিকে পতিতাদের জন্য হলুদ চুল নির্ধারিত ছিল। হলুদ রং তাদের পেশা নির্দেশ করত। বেশির ভাগই তারা পরচুলা পরতেন। তবে অনেকে পোড়া গাছের ছাল বা বাদাম থেকে তৈরি দ্রবণে চুল ভিজিয়ে রেখে রাসায়নিকভাবে হেয়ার ডাই করতেন। ইতিমধ্যে জার্মানরা বিচউডের ছাই এবং ছাগলের চর্বির মিশ্রণ বানিয়ে চুল লাল করে ফেলেছে।

আধুনিক যুগের সূচনাকালে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিকাশের সঙ্গে চুলের রং পরিবর্তনের ইচ্ছায় ডাইয়াররা নতুন সূত্রের কার্যকারিতা এবং সুরক্ষা পরীক্ষা করতে আরও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অনুসরণ করে। ষোলো শতকের গোড়ার দিকে প্রকাশিত গৃহস্থালি কার্যকৌশলের বই ‘ডিলাইটস ফর লেডিস’-এ কালো চুল বাদামি করার জন্য ওয়েল অব ভিট্রিওল ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়। বইটি ত্বকের স্পর্শ এড়িয়ে চলতে পরামর্শ দেয়। এখন আমরা জানি, ওয়েল অব ভিট্রিওলকে সালফিউরিক অ্যাসিড হিসেবে জানি।

কয়েক শ বছর পর সতেরো শতকের দিকে ইতালীয় স্বর্ণকেশী ফ্যাশন নিজে থেকে ফিরে আসে। ভেনিসের নারীরা তখন সোনালি রঙের চুল পেতে বিশেষ দ্রবণে চুল চুবিয়ে সুরম্য ভবনে হেলান দিয়ে রোদে বসে থাকত। হলুদ সোনালি চুল আর পতিতাদের সীমাবদ্ধ ছিল না।

তারপরও হেয়ার ডাই ফ্যাশনের চেয়ে বেশি অথবা বিশেষ পেশা বোঝাতে ব্যবহার হতো। কর্ডওয়েল উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন, তখন অন্যান্য কারণেও চুলের রং বদলের প্রচলন ছিল। যেমন আফগানরা বিশ্বাস করত, মেহেদি দিয়ে করা লাল হেয়ার ডাই মাথা ধরার উপশমের কাজ দেয়।

বিউটি ইন্ডাস্ট্রি একটি বহু বিলিয়ন ডলারের ইন্ডাস্ট্রি, যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটি ইন্ডাস্ট্রি প্রতিবেদনমতে, ২০১৪ সালে বিশ্বে ২৫৫ বিলিয়ন ডলারের রাজস্ব এনেছে কসমেটিকস উৎপাদন খাত। মন্দার মধ্যেও এই শিল্পটি স্থিতিশীল ছিল। মন্দা কাটিয়ে আয় বাড়ার সাথে সাথে এই শিল্পে উচ্চমূল্যের পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ২০১৯ সাল নাগাদ ৩১৬ বিলিয়ন ডলার মুনাফা বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী বিউটি ইন্ডাস্ট্রির বড় অংশ রয়েছে হেয়ার কেয়ারের দখলে। ইন্ডাস্ট্রির এক-চতুর্থাংশ মুনাফাই আসে এই খাতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হেয়ার অ্যান্ড নেইল সেলুন এবং হেয়ার কালারিং সার্ভিস থেকে মোট রাজস্বের ১৮ শতাংশ আসে। দেশটির ৭০ শতাংশের বেশি নারী হেয়ার কালার পণ্য ব্যবহার করে থাকে।

হেয়ার ডাইয়ের ঐতিহ্যকে আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না, আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, কেন এখনো এত বিপুল মানুষ চুলে রং করে? কেউ কেন অনর্থক জটিলতা এবং বেহুদা খরচ, অ্যালার্জি এবং সহ্য করে? আমাদের চুলের রং পরিবর্তনের যে আকাঙ্ক্ষাই থাকুক না কেন, মাথার ঢেকে রাখা ত্বকের সঙ্গে গভীর মানসিক সম্পর্ক রয়েছে।

বার্কলে কানিংহামের জন্য এটি স্পষ্ট সত্য। মাত্র বারো বছর বয়সে হেয়ার লাইটেনিং রাসায়নিক স্প্রে ব্যবহার করে নিজের চুল নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেছিলেন। বছরের পর বছর তিনি চুলের সঠিক রংটির খোঁজে বেড়িয়েছেন। বার্কলে বলেছেন, চুলে কোনো না কোনো রং করা হয়নি এমন একটি মুহূর্তও আমার জীবনে আসেনি। ●

হেয়ার ডাই যুগে যুগে...

মানুষ প্রাচীনকাল থেকে চুলে রং করছে। কিন্তু আজও রসায়ন এবং স্বাস্থ্যের ওপর এর প্রভাব সম্পর্কে খুব সামান্যই জানে। হেয়ার ডাই নিয়ে রেবেকা গেনার্ডের এই গুরুত্বপূর্ণ লেখাটি ২০১৫ সালের ২ জানুয়ারি প্রকাশ করেছে দ্য আটলান্টিক। সংক্ষেপে অনুবাদ করেছেন

সালেহ ফুয়াদ

প্রতি দুই মাসে একবার এই কাজটা করেন বার্কলে কানিংহাম। কাজটা শুরু করেন একটি অ্যান্টিহিস্টামিন ট্যাবলেট গ্রহণের মাধ্যমে। কয়েক ঘণ্টা পর কপালে, কানের চারপাশে, ঘাড়ে অ্যান্টিহিস্টামিনের একটি ঘন স্তর মাখেন যত্ন করে। সর্বশেষ ছিঁড়ে যাওয়া প্লাস্টিকের শপিং ব্যাগ দিয়ে পুরো জায়গাটা ঢেকে দেন।

এসব যাবতীয় কাজ তিনি করেন হেয়ার ডাই করার জন্য।

মন্দ চলছিল না এই কাজ। কোনো সমস্যা ছাড়াই কানিংহাম এক দশক ধরে চুলে রং করে আসছেন। তারপর একদিন লক্ষ করলেন, হেয়ার ডাই করার পর তার কানের ত্বক পুড়ে গেছে। তিনি প্লাস্টিকের শপিং ব্যাগ দিয়ে কানঢাকা টুপি তৈরি করে রঙের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু অ্যালার্জি নাছোড়বান্দার মতো পিছে লেগেছিল। এতে কানিংহামের বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হলো। এসব সতর্ক ব্যবস্থাপনা ছাড়া এখন হেয়ার ডাই করতে গেলে চুলকানি, ফোসকা পড়া, পুঁজভরা ফুসকুড়ি দেখা দেয়; যা লাগাতার কয়েক সপ্তাহ ধরে ভোগায়।

চুলের রং করা নিয়ে ভোগান্তিতে পড়া নতুন কিছু নয়। মানুষ হাজার বছর ধরে চুলে রং করছে। একটি নতুন রং পেতে স্থায়ীভাবে পরিবর্তনশীল এবং কখনো দূষিত উপাদান ও সূত্র নিয়েও নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে আসছে।

আধুনিক হেয়ার ডাইয়ের রাসায়নিক ইতিহাস বলে, এসব একসময় উদ্ভাবনী শিল্পের অংশ ছিল। এরপর এর অগ্রগতি থেমে যায়। এখন পুরোনো পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে চলছে এ শিল্প। ভোক্তারাও এই শিল্পকে উদ্ভাবনী হতে কোনো রকম চাপ দিচ্ছে না। ভোক্তারা যখন চুলের রং পরিবর্তনের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে, তখন তারা ত্বকের ব্যধি মেনে নিতে প্রস্তুত থাকে। কানিংহাম যেমন রং করার কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত ত্বকের অসুখে ভোগে।

আঠারো শতকের মাঝামাঝিতে ইংরেজ রসায়নবিদ উইলিয়াম হেনরি পারকিন সৌভাগ্যক্রমে প্রথমবার অপ্রাকৃতিক ডাই তৈরি করেছিলেন। তিনি এটি শুরু করেছিলেন কয়লা ও আলকাতরা দিয়ে। তিনি চেয়েছিলেন ম্যালেরিয়ার ওষুধ কুইনিন উৎপাদন করতে। কিন্তু পরিবর্তে উৎপাদন করলেন মাউভ (ফিকে লাল রং)। তার এই আবিষ্কার টেক্সটাইলশিল্পে বিপ্লব ঘটায় এবং পেট্রোকেমিক্যালশিল্পের সূচনা ঘটায়। প্রাকৃতিক ডাইয়ে স্থায়ী শক্তি ছিল না। পারকিনের তৈরি ডাইয়ের মতো উজ্জ্বল রংও ছিল না। এর আগে কখনো এমন অবিচল রং পাওয়া যায়নি।

মেহেদি দিয়ে চুল রং করার চল প্রাচীন মশিরীয়দের দিয়ে।

ওয়েলা ০৫০ কুলিং টোনার সঙ্গে ৬ শতাংশ পারক্সাইড, ফিল্মে রাঙানোর ২০ মিনিট পরের অবস্থা।

এর কিছু পরেই পারকিনের রসায়নের অধ্যাপক অগাস্ট হফম্যান লক্ষ করলেন, কয়লা ও আলকাতরা থেকে পাওয়া একটি ডাই বাতাসের স্পর্শে এলে একটি রং ধারণ করে। যে অণুর কারণে এটি হচ্ছিল তার নাম প্যারা-ফেনাইলেনডিয়ামাইন বা পিপিডি। এটিই আজকের দিনে সবচেয়ে স্থায়ী হেয়ার ডাইয়ের মূলভিত্তি।

যদিও চুল উলের মতো একটি প্রোটিন ফাইভার, তবুও টেক্সটাইলের ডাইং প্রসেস মাথায় বসানো যায় না। উলে ডাই করতে হলে তাকে ঘণ্টাখানেক অ্যাসিডের মিশ্রণে ফুটাতে হবে। চুলের ক্ষেত্রে সমতুল্য ফলাফল পেতে রাসায়নিক অ্যামোনিয়াতে ধুতে হয়। অ্যামোনিয়া প্রতিরক্ষামূলক প্রোটিনের লেয়ারগুলোকে আলাদা করে; যা ডাইয়ের মিশ্রণকে চুলের খাদে প্রবেশ করতে দেয় এবং ভেতরে থাকা রঙ্গক ও মেলানিনকে নিয়ন্ত্রণ নিতে দেয়।

মেলানিন মানুষের ত্বক, চোখ এবং চোখকে রং দেয়। দুই ধরনের মেলানিন তথা–ইউমেলানিন এবং ফিওমেলানিনের অনুপাত মানুষের প্রাকৃতিক চুলের রং নির্ধারণ করে। অ্যামোনিয়ার পাশাপাশি হেয়ার ডাই সূত্রে ব্লিচিং এজেন্ট হিসেবে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড থাকে। পারঅক্সাইড দুটি উদ্দেশ্যে কাজ করে: এটি চুলে মেলানিনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে, এর প্রাকৃতিক রং নিভিয়ে দেয় এবং পিপিডি অণুসমূহের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটাতে উৎসাহিত করে। আটকে থাকা রং নিঃসরণকারী অণু চুলে থেকে যায় এবং চুল বড় হওয়ার সাথে সাথে প্রাকৃতিক রং বেরিয়ে আসে।

প্রথম দিকে ডাই কেমিস্ট্ররা বুঝতে পেরেছিলেন, তারা যদি একটি সেকেন্ডারি অণু যোগ করেন, যাকে কাপলার বলা হয়, তাহলে তারা এখানে একটি রাসায়নিক কার্বন, ওখানে কয়েকটি নাইট্রোজেন পরিচালন করতে পারবে এবং পিপিডির সঙ্গে একা থাকা বেছে নেওয়া রংসমূহকে বৃদ্ধি ঘটাতে পারবে। এমন বিভিন্ন পদ্ধতি প্রস্তাব করা হয়েছে, কিন্তু বিউটি ম্যানুফ্যাকচাররা এখনো পিপিডি এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত মিশ্রণ পি-অ্যামিনোফেনল ছাড়া স্থায়ী হেয়ার কালারের কোনো সূত্র গ্রহণ করতে পারেনি।

১২৫ বছর ধরে পিপিডির অক্সিডেটিভ প্রতিক্রিয়া হলো *এরপর পৃষ্ঠা ১৫*